Downloaded from: justpaste.it/amra-shirke-lipto-na-to-probondo

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’
প্রাসঙ্গিক গবেষণা-প্রবন্ধ সংকলনঃ- ০৩. নিজের অজান্তে আমরা শিরকে লিপ্ত না তো?

কয়েকটি জরুরি জ্ঞাতব্যঃ-

- নীচের প্রবন্ধটি "সরকারী পাঠ্যবই ও ইসলাম সিরিজের" প্রাসঙ্গিক জরুরি একটি গবেষণাপ্রবন্ধ।
- এই প্রবন্ধটি অসংখ্য লেখা ও আর্টিকেলের নির্বাচিত অংশের সমষ্টি। যে লেখাগুলো অনলাইনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। তাই এগুলো আমার নিজের লেখা নয়; এ হিসেবে আমি উক্ত লেখাগুলোর একজন সংকলক মাত্র। আল্লাহ মূল লেখকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়র দিন।
- প্রবন্ধটি অসংখ্য আর্টিকেলের সংকলন হলেও এখানে বহুবিদ সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। ভাষাসম্পাদনা, অঙ্গসজ্জা, শারঈ সম্পাদনাসহ সার্বিক সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। সেগুলো আমার করা। এ হিসেবে আমি এ প্রবন্ধের একজন সম্পাদকও বটে।
- শেষে উল্লেখিত ফাতওয়াটি একজন বিজ্ঞ ও মুহাক্কিক মুফতির কাছ থেকে সংগৃহীত। যেহেতু সমগ্র প্রবন্ধজুড়ে ফাতওয়ার শারঈ দলীলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে একবার উল্লেখ করা আছে, তাই ফাতওয়ার নীচে নতুনভাবে আর দলীলগুলো দেওয়া হয়নি।
- প্রবন্ধটি যেহেতু ২১শে ফেব্রুয়ারি ও ভাষাদিবসকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে; সেহেতু স্থানে স্থানে শহীদ মিনারের নাম উল্লেখ করে লেখা হয়েছে। তবে এ প্রবন্ধটি সকল প্রকার দিবসের অসারতা প্রমাণের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য।
- প্রবন্ধের শুরুতে "ইসলামে দিবস পালনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ০৫টি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে, যা জানলে শহীদ মিনারের বৈধতা-অবৈধতা উপলব্ধি করা সহজ হবে।
- "সেদিন মূর্তির সম্মানে যা যা করা হয়ঃ শহীদ মিনারকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ: যেগুলো ইসলামে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ" এই শিরোনামের অধীনে সেদিন পালনকৃত হারাম ও শিরকমিশ্রিত কার্যক্রমগুলোকে লিস্টেড করা হয়েছে। এবং সেগুলো কেন হারাম, সেটাও প্রবন্ধজুড়ে স্পষ্ট করা হয়েছে।
- প্রবন্ধটির শেষে এবিষয়ে শরীয়াহর অবস্থান নিয়ে সংশয়বাদীদের অলীক সংশয়সমূহ ও সেগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে।
- সম্মানিত পাঠক ভাইবোনদের নিকট আবেদন থাকবে, দিবসপালন বিষয়ক জরুরি কোনো লেখা, আর্টিকেল, প্রবন্ধ বা তথ্য আপনার সংগ্রহে থাকলে কমেন্টে পেস্ট করে দিতে পারেন। সবাই আরো জানবে, আরো বেশি সচেতন হবে।
- এ প্রবন্ধে কোনো ভুলত্রুটি থেকে গেলে সেটার দায় একান্তই লেখক ও সম্পাদকের। তখন সেটা

আমাদের ব্যক্তিগত মতামত বলে গণ্য হবে।

- একটু দীর্ঘ হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি একইথ্রেডে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই প্রবন্ধের বাকি অংশ পোস্টের প্রথম কমেন্টে থাকবে।

আশা করি প্রবন্ধটি সকল দ্বীনমুখী ভাইবোন ও দ্বীনবিরোধীদের জন্য সহায়ক হবে। কারো দ্বীনের পথে অটল থাকার; আর কারো দ্বীনের দিকে ফিরে আসার। পরিশেষে একটা আবেদন করতেই পারি, আপনাদের নেক দুআয় আমাদেরকে ভুলবেন না।

ইসলামে দিবস পালনের বিষয়ে কয়েকটি মূলনীতি জানলেই শহীদ মিনারের বৈধতা-অবৈধতা উপলব্ধি করা সহজ হবে। আমরা কুরআন ও হাদিসের আলোকে মূলনীতিগুলো উল্লেখ করছি। এতে ভাষা শহীদ দিবসসহ অন্যান্য সকল দিবস পালনের অসারতা ও অবৈধতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে।

১ নং মূলনীতিঃ ইসলামে জাতিগতভাবে উৎসব পালনের জন্য শুধুমাত্র দুটি দিন নির্ধারণ রয়েছে। এক হলো ইদুল ফিতর আর দ্বিতীয়টি হলো ইদুল আজহা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই আমি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি যা তারা পালন করে। সুতরাং তারা যেন এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে বিতর্ক না করে। [সূরা আল হাজ্ব, আয়াত ৬৭]

আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মদিনায় আসলেন তখন তাদের দুটি উৎসবের দিন ছিল। তিনি বললেন, এ দুটি দিনের তাৎপর্য কী? তারা বলল, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা এ দুটি দিনে উৎসব পালন করতাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ দিনগুলোর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উত্তম দুটি দিন দিয়েছেন; কুরবানির ইদ ও রোজার ইদ। [সুনানু আবি দাউদঃ ১/২৯৫, হাদিস নং ১১৩৪, প্রকাশনীঃ আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে জাতীয়ভাবে দুটি উৎসবই নির্ধারিত। আর কুরআনের ভাষ্যমতে মুসলিমদের জন্য নিজ ধর্মের অনুমোদিত উৎসবই শুধু বৈধ, এর বাইরে অন্য কোনো উৎসব-পার্বন পালনের অনুমতি নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় এসে প্রথমেই যে সকল কুসংস্কৃতি বন্ধ করেন, তন্মধ্য হতে অন্যতম ছিল নববর্ষ পালন উৎসব। ইসলামপূর্ব সময়ে মদিনাতেও নববর্ষ পালনের প্রথা চালু ছিল। কিন্তু ইসলাম এসে তা বন্ধ করে তাদের উৎসবের জন্য নতুন দুটি দিবস দান করে। অতএব, বিধর্মীদের উদযাপিত নববর্ষের পরিবর্তে ইসলাম-প্রদত্ত দুটি দিবস পেয়েও যারা সন্তুষ্ট নয়, এখনও যারা নববর্ষ পালন করতে আগ্রহ দেখায় বা পালন করে, তারা মূলত ইসলামের পূর্ণতাকে অস্বীকার করে পূর্বের সে জাহিলিয়াতের দিকেই ফিরে যেতে চায়। এমনটি করা একজন মুসলিমের পক্ষে

কী করে সম্ভব যে, যে দিবসের পরিবর্তে আল্লাহ্ তাকে উত্তম দিবস দান করলেন, তথাপিও নিষিদ্ধ সে দিবস পালন করার জন্যই সে উদগ্রীব হয়ে থাকে।

২ নং মূলনীতিঃ ইসলামে বিধর্মী ও বদদ্বীন লোকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি অন্য জাতির সঙ্গে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। [মুসনাদুল বাজ্জারঃ ৭/৩৬৮, হাদিস নং ২৯৬৬, প্রকাশনীঃ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা]
এ হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, বিজাতীয় ও বদদ্বীন লোকদের অনুষ্ঠান বা মেলায় শরিক হওয়া, এতে সমর্থন দেওয়া নাজায়িজ ও হারাম। অতএব, যারা এসব বিজাতীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে, তারাও এ ক্ষেত্রে তাদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে।

৩ নং মূলনীতিঃ অশ্লীলতাপূর্ণ উৎসব পরিত্যাগ করা মুসলিমদের জন্য একান্ত আবশ্যক। নিজে অশ্লীল কাজ করা বা এর প্রচার কামনা করা জঘন্যতম অপরাধ ও হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যারা চায় যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না। [সূরা নূর, আয়াত ১৯]

আমাদের কারও অজানা নয় যে, দিন দিন পহেলা বৈশাখে অশ্লীলতা কী পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব, পহেলা বৈশাখসহ অশ্লীলতাপূর্ণ সকল কর্মকাণ্ড মুসলিমদের জন্য হারাম। তাতে শরিক হওয়া কিংবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করা সবই নাজায়িজ।

৪ নং মূলনীতিঃ অপচয় ও অনর্থক কাজ থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আর তোমরা খাও এবং পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না। [সূরা আল আরাফ, আয়াত ৩১]
আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেনঃ নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা হলো শয়তানের ভাই। [সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ২৭]
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো, অনর্থক বিষয় ত্যাগ করা। [সুনানুত তিরমিজিঃ ৪/১৩৬, হাদিস নং ২৩১৭, প্রকাশনীঃ দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত]
এসব দিবসে কী পরিমাণ অপচয় হয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৫ নং মূলনীতিঃ সংশয়পূর্ণ বিষয় পরিত্যাগ করে সংশয়মুক্ত বিষয় গ্রহণ করার নির্দেশ রয়েছে। হাসান বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করবে তা পরিত্যাগ করো আর যাতে কোনো সন্দেহ নেই সেটিই করো। [সুনানে নাসায়ীঃ ৮/৩২৭, হাদিস নং ৫৭১১, প্রকাশনীঃ মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হালব]

সুতরাং কোনো বিষয়ে মতানৈক্য বা মতবিরোধ থাকলে তা যদি আবশ্যকীয় কাজ না হয়ে থাকে তাহলে একজন মুমিনের কর্তব্য হলো তা পরিত্যাগ করা। কেননা কাজটি বৈধ হলেও তা না করার কারণে তার কোনো গুনাহ হবে না, কিন্তু তা অবৈধ হয়ে থাকলে এতে জড়িত হওয়ার দরুন সে গুনাহগার হয়ে পড়বে, যা কখনো একজন সাচ্চা মুমিনের কামনা হতে পারে না। তাই শরিয়তের অপব্যাখ্যা করে কেউ ভাষাদিবস, পহেলা বৈশাখ পালন জায়িজ হওয়ার কথা বললেও তার কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।

সারকথাঃ এ পাঁচটি মূলনীতিকে সামনে রেখে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে বুঝে আসে যে, বর্তমানের প্রচলিত পহেলা বৈশাখ, নারী-দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ভ্যালেন্টাইন্স ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইট সহ এ জাতীয় দিবসসমূহ পালন করা, এতে শরিক হওয়া ও এর সমর্থন করা হারাম ও নাজায়িজ। কেননা আমাদের মুসলিমদের জন্য কুরআন এবং সুন্নাহর বাহিরে যাওয়ার কোনো অধিকার নেই। আর কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের উৎসবের জন্য নির্ধারিত দুটি দিন রেখে অন্যান্য সকল উৎসবকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

এক.

সারা পৃথিবীতে দিবস পালনের ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে দিবস পালিত হয়। সব দিবস এক রকম নয়। কিছু দিবস আছে সাধারণ সচেতনতামূলক। কিছু পরামর্শ ও নির্দেশনাদানই ঐসব দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য। কিছু দিবস আছে, যেগুলোতে কিছু সেবামূলক কার্যক্রমও হয়ে থাকে। যেমন পলিও টিকা দিবস। এই সব দিবসের আয়োজন-অনুষ্ঠানের কিছু সুফল আছে। পক্ষান্তরে কিছু দিবস আছে, যেগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয়টি নীতি ও আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত। এখানে সুফল পাওয়া, না পাওয়াটা নির্ভর করে নৈতিক ও আদর্শিক উন্নতি-অবনতির উপর। শুধু পরামর্শ ও সচেতনতা কেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিকতায় যা নেই। নৈতিক ও আদর্শিক উন্নতি-অবনতির উপর নির্ভরশীল দিবসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে, নারী-দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ভ্যালেন্টাইন্স ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইট, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি যেগুলো কোনো ভাবেই পালন করা জায়েজ নেই।

যদি কোনো দিবস এমন হয়ে থাকে, যে দিবসগুলো পালন করার মধ্যে অমুসলিমদের সঙ্গে বা ইসলাম ব্যতিত অন্য কোনো কালচার, সংস্কৃতি, সভ্যতা অথবা অন্য কোনো জীবনবিধানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বা অন্য কোনো সম্পর্ক থাকে, তাহলে এ ধরনের দিবস পালন করা ইসলামী শরিয়তে সুস্পষ্ট হারাম। ইসলামে এই দিবসগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। যেমন : থার্টিফার্স্ট নাইট। এটি বিজাতীয় কালচার ছাড়া আর কিছুই নয়। যেটা অনৈসলামিক সভ্যতা থেকে আমদানি করা হয়েছে। রাসুল (সা.)-এর সময় এ ধরনের একটি দিবসও পালিত হতো না। নবী করিম (সা.), সাহাবা রা. সালাফে সালেহিন এগুলোকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

কিছু দিবস রয়েছে, যেগুলো মানুষকে সচেতন করার জন্য বা সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে মেসেজ দেওয়ার জন্য পালন করা হয়ে থাকে। তবে ইবাদতের কোনো ফরম্যাট এর মধ্যে থাকতে পারবে না, অন্যথায় এই কাজটি বিদআত হয়ে যাবে। এবং এই দিবসগুলোও শরীয়তসম্মত পন্থাতেই পালন করতে হবে। শরীয়তসম্মত পন্থার ব্যাখ্যা সামনে আসবে।

যেকোনো ধরণের দিবস পালনে হুকুম সম্পর্কে উলামায়ে কেরামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কিছু উলামায়ে কেরাম বলেন, দিবস পালনের মূল বিষয়টি এসেছে বিধর্মীদের থেকে। সুতরাং বলা যায় এর মূল জিনিসটিই ইসলামে প্রত্যাখ্যাত। তা যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক। যে কোনো শিরোনামেই হোক। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء

তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বন্ধু বা অভিভাবকের অনুসরণ করো না। (সূরা আ'রাফ ৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুরূপ অবলম্বন করে, সে তাঁদেরই দলভুক্ত। (আবূ দাঊদ ৪০৩১)
সুতরাং যারা হিন্দুদের অনুকরণ করবে তারা হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে, যারা ইয়াহুদী-খ্রীস্টানদের অনুকরণ করবে তারা ইয়াহুদী-খ্রীস্টানদের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য হবে।

ইমানদার ব্যক্তিগণ বেহুদা কাজ থেকে নিজেদের দূরে রাখবেন। এসব কাজে সময় নষ্ট করার সামান্যতম কোনো সুযোগ তাঁদের নেই। রাসুল (সা.) হাদিসের মধ্যে বলেছেন, 'একজন মুসলিমের প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে সেখানেই, সে এমন কাজ পরিহার করে চলবে, যেটা তার জন্য অপ্রয়োজনীয়।'

একজন গায়রতমান সচেতন মুসলিম লিখেছেন, "কোন বিবেকবান মুসলমান ইট পাথর দিয়ে বানানো শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, মূর্তি, ভাস্কর্যে ফুল-চন্দন, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পুষ্পার্ঘ্য দিতে পারে? আপনারাই বলুন, কোন বিবেকবান মুসলমান শহীদ মিনারে ফুল-চন্দন দিতে পারে?
আমি যখন ছোট ছিলাম তখন গ্রামে বড় হই। গ্রামে আমাদের বাগানে অনেক ফুল ফুটতো। সেইজন্য মাঝে মাঝে হিন্দুরা আসতো ফুল নিতে। এই ফুল দিয়ে তারা মূর্তিপূজা করতো, তাদের ঠাকুর দেবতাদেরকে শ্রদ্ধা জানাতো। তখন ইসলাম সম্পর্কে এতো কিছু জানতাম না, সেইজন্য আমরা ফুল দিতে তাদেরকে মানা করতাম না। যাই হোক, আমার মনে হয়না কোন মুসলমান এই কথাকে অস্বীকার করতে পারবে যে, ইট-পাথর, মিনার, সৌধ বা স্তম্ভে ফুল দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, পুষ্পার্ঘ দেওয়ার এই সংস্কৃতি হিন্দুদের কাছ থেকে এসেছে। হিন্দুরা মূর্তিকে ফুল দেয় আর অজ্ঞ, নামধারী মুসলমান, মুনাফেক শ্রেণীর রাজনীতিবিদেরা অলি-আওলিয়ার নামে, শহীদের নামে, পাথর, সৌধ বা মিনারের নামে ফুল দেয়। "

দুই.

ধ্বংসপ্রাপ্ত আদ জাতির স্বভাব ছিলো উঁচু উঁচু স্তম্ভ নির্মান করা। তাদের কাছে হুদ আলাইহিস সালাতু আস-সালামকে নবী করে পাঠানো হয়েছিলো। হুদ (আঃ) তার পথভ্রষ্ট জাতির লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

أتبنون بكل ريع آية تعبثون তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মান করছ? সূরা শুআরা (128)

ইবনে কাসীর র. তাঁর বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থে উক্ত আয়াতের অধীনে বলেনঃ

إلى أن قال : (أتبنون بكل ريع آية تعبثون) ، اختلف المفسرون في الريع بما حاصله : أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة . تبنون هناك بناء محكما باهرا هائلا ; ولهذا قال : (أتبنون بكل ريع آية) أي : معلما بناء مشهورا ، تعبثون ، وإنما تفعلون ذلك عبثا لا للاحتياج إليه ; بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة ; ولهذا أنكر عليهم نبيهم ، عليه السلام ، ذلك ; لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة ، واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة .

ভাবানুবাদঃ- .... তোমরা তো প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা ইমারত (স্তম্ভ) নির্মাণ করছ (পথিকের সাথে হাসি-তামাশা করার জন্য) رِيع শব্দটি رِيعَة এর বহুবচন। যার অর্থ উঁচু ভূমি, উঁচু ঢিবি, পাহাড়, উপত্যকা বা রাস্তা। তারা রাস্তার উপর অযথা এমন ইমারত (বা স্তম্ভ) তৈরী করত যা উচ্চতায় একটি নিদর্শন হত। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য তাতে বাস করা নয় বরং শুধু খেল-তামাশা করা হত। হূদ (আঃ) তাদেরকে এই বলে নিষেধ করলেন যে, তোমরা এমন কাজ করছ, যাতে সময় ও সম্পদ উভয়ই নষ্ট হচ্ছে। আর তার পশ্চাতে উদ্দেশ্যও এমন, যাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কোনই উপকার নেই। বরং তার বেকার ও অনর্থক হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।

তারা তাদের শক্তি ও ধনৈশ্বর্যের নিদর্শনরূপে উঁচু উঁচু প্রসিদ্ধ পাহাড়ের উপর উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। হযরত হূদ (আঃ) তাদেরকে এভাবে মাল অপচয় করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা, ওটা শুধু মাল অপচয় করা, সময় নষ্ট করা এবং কষ্ট বাড়ানো ছাড়া কিছুই ছিল না। ওতে না ছিল দ্বীনের কোন উপকার এবং না ছিল কোন উপকার দুনিয়ার। তাদের নবী হযরত হূদ (আঃ) তাই তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে নিরর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছো? তোমরা কি মনে করেছে যে, এখানে তোমরা চিরস্থায়ী হবে? দুনিয়া তোমাদেরকে আখিরাতের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। জেনে রাখো যে, তোমাদের এ মনোবাসনা নিরর্থক। দুনিয়া তো নশ্বর।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর বসা ও সৌধ তৈরী করা থেকে নিষেধ করেছেন। [মুসলিম]

তিন.

ইসলামে মূর্তি ও ভাস্কর্য পরিষ্কার হারাম। এতে কোনো প্রকার ব্যাখা বিশ্লেষণ নাই। বরং কুরআন হাদীসের স্পষ্ট নস দ্বারা হারাম। শহীদ মিনার স্থাপন করা ইসলাম সম্মত নয়। তাছাড়া ভাস্কর্য স্থাপন করা বা এতে ফুল অর্পন করা কখনো জায়েয হবে না। এগুলো কুসংস্কার ও পরিত্যাজ্য। তবে শহীদ মিনার বা স্মৃতিসৌধ সুস্পষ্ট মুর্তির হুকুমে পড়বে না। কিন্তু এগুলো নির্মাণ করাও যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল, তখন তারা বললঃ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বললঃ আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মান করব।
(সূরা কাহফ-২১)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরিনে কেরাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন, নিম্নে দু'একটি আলোচনা তুলে ধরছি। **তাফসীরে কুরতুবী**তে উক্ত আয়াতের ব্যখায় নিম্নোক্ত আলোচনা এসেছে - হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وروي عن عبد الله بن عمر أن الله - تعالى - أعمى على الناس حينئذ أثرهم وحجبهم عنهم ، فذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون معلما لهم . وقيل : إن الملك أراد أن يدفنهم في صندوق من ذهب فأتاه آت منهم في المنام فقال : أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب فلا تفعل ; فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود ، فدعنا

মানুষের সামনে আসহাবে কাহফের চিহ্ন মুছে যাবার পর কিছু মানুষ সেই স্থলে স্মৃতিচারণের জন্য একটি ঘর নির্মাণের প্রস্তাব দিলো।
(কেউ কেউ বলেন) বাদশা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আসহাবে কাহফের অধিবাসীদেরকে স্বর্ণের তৈরী একটি সিন্দুকে ভরে দাফন করে দিবেন। তখনই তাদের মধ্যকার একজন স্বপ্নযোগে বাদশাকে বললেন, তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছ আমাদেরকে সিন্দুকে ভরে দাফন করার। তুমি এমন করবে না। আমরা মাটির তৈরী এবং আমরা আবার সেথায়ই ফিরে যাবো। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও।

তাফসিরে তাবারীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত রেওয়াত উল্লেখ করা হয়,

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: عمَّى الله على الذين أعثرهم على أصحاب الكهف مكانهم، فلم يهتدوا، فقال المشركون: نبني عليهم بنيانا، فإنهم أبناء آبائنا، ونعبد الله فيها، وقال المسلمون: بل نحن أحق بهم، هم منا، نبني عليهم مسجدا نصلي فيه، ونعبد الله فيه.

ভাবার্থ- আসহাবে কাহফের সন্ধানলাভকারীকে দলকে আল্লাহ তা'আলা সেই স্থান ভুলিয়ে দিলেন। যদ্দরুণ তারা সে স্থানের পরিচয় লাভে সক্ষম হয়নি। তখন মুশরিকরা বলল, আমরা একটি প্রসাদ নির্মাণ করব, কেননা তারা আমাদেরই সন্তান। এবং আমরা সেই প্রসাদে বসে আল্লাহর ইবাদত করব। মুসলমানরা বলল, বরং আমরাই বেশী হকদ্বার, এরা তো আমাদের থেকেই এবং আমাদের মত মুসলমান। আমরা তথায় মসজিদ নির্মাণ করব। যেখানে আমরা নামায আদায় করব। এবং আল্লাহর ইবাদতে মাশগুল থাকব।

চার.

সুতরাং সকল প্রকার দিবস পালন করা সুস্পষ্ট হারাম । বর্তমান যুগে আমরা স্বাধীনতা দিবস, মাতৃভাষা দিবস, বিজয় দিবস, জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস, মা দিবস, বাবা দিবস, ভালোবাসা দিবস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার দিবস পালন করে থাকি। অথচ ইসলামী শরীয়ত কোন দিবস পালন করা সমর্থন করে না। ইসলামী শরীয়ত যদি দিবস পালন করা সমর্থন করতো তাহলে ৩৬৫ দিনের কোন না কোন একটা দিনকে দিবস হিসেবে পালন করা হতো। ইসলামী ইতিহাস তালাশ করলে আপনি দেখতে পাবেন কত শত স্মরণীয় দিন আছে যেগুলো বর্তমান যুগের দিবসের তুলনায় শত শত গুণ বেশী মর্যাদাসম্পন্ন। অথচ নবী যুগ থেকে সাহাবাদের যুগ অর্থাৎ যে যুগকে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলা হয় তাদের কোন যুগে এমন কোন ইতিহাস নেই যে, তারা দিবস পালন করেছেন।
আজ আমরা বিভিন্ন ধরনের দিবস পালন করার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী কাজ তথা হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছি। দিবস পালন করা হারাম হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে ইসলামে দুটি দিবস ব্যতীত অন্য তৃতীয় কোন দিবস পালন করা নিষেধ। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় পৌঁছে দেখতে পান সেখানকার অধিবাসীরা বছরে দুই দিন খেলাধুলা (আনন্দ উৎসব) করে থাকে। তিনি তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা এ দুই দিন খেলাধুলা (আনন্দ উৎসব) করতাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহ তোমাদের এ দুই দিনের পরিবর্তে অন্য দুটি উত্তম দিন দান করেছেন। তা হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। [আবু দাউদ, ১/৪৪১]

এই হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঐ দুটি দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি উত্তম দিন প্রদান করেছেন। এখানে যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন; তোমাদের ছিল দুটি দিন আর আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন আরো দুটি দিন, তাহলে মুসলিমরা ১৪০০ বছর যাবৎ ৪টি উৎসবের দিন পালন করে আসতো। যেহেতু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য মানবরচিত দিনগুলো পরিবর্তন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুটি উত্তম দিন প্রদান করেছেন সেহেতু অন্য যে কোন দিবস পালন করা এমনেতেই বাতিল হয়ে যায়।
তাই মুসলিমদের জন্য অন্য কোন প্রকার দিবস পালন করা বৈধ নয়। হোক সেটা জন্ম দিবস, শোক দিবস,

মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিজয় দিবস, নববর্ষ ইত্যাদি যা-ই হোক না কেন, তা পালন করা বৈধ হবে না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এ ধরণের যত প্রকার দিবস রয়েছে সেগুলোর কোনটাই মুসলিমদের সংস্কৃতি নয়। যদি এগুলো মুসলিমদের সংস্কৃতি হতো তাহলে এগুলো সাহাবাদের যুগ থেকেই পালিত হয়ে আসতো। যেহেতু এগুলো মুসলিমদের সংস্কৃতি নয় তাহলে বুঝাই যাচ্ছে যে, এগুলো কাফের মুশরিক বিজাতীয়দের সংস্কৃতি থেকে এসেছে। আর এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে মিল বা সাদৃশ্য রাখবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। [আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১]

লোক-সংস্কৃতি বা আঞ্চলিক সংস্কৃতি ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ না তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। যদি কোথাও সংস্কৃতি এবং ইসলাম সাংঘর্ষিক হয়; তাহলে ইসলামই গালেব। ইসলামই গ্রহণযোগ্য। সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে ইসলামত্যাগ করা কোনোভাবেই জায়েজ নেই। এটি সর্বস্বীকৃত হারাম এবং অবৈধ। আর সবচেয়ে বড় কারণ যেটা সেটা হলো, এই দিন সমূহকে কেন্দ্র করে অনেক ধরনের শিরকি কর্মকাণ্ড করা হয়ে থাকে। যেমনঃ শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন ইত্যাদি। তাই অনেক উলামায়ে কিরাম কিছু কিছু দিবস পালন করাকে শিরকও বলেছেন। তাই আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিজাতীয়দের সংস্কৃতি বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। অতএব মুসলিমরা যদি জান্নাতের আশা করে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চায় তাহলে তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে আসা উচিত।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম৷ জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সব বিষয়ের নির্দেশনা ইসলাম দিয়েছে৷ ইসলামে শহীদদের কবরে বা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পনের কোনো রীতি নেই৷ রাসূল সা, থেকে নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযামসহ ইসলামের সোনালী যুগে শহীদদের জন্যে ফুল দেয়ার কেনো রীতি ছিলো না৷ আর ইসলামে অনুমোদিত নয় এমন প্রত্যেক বিষয়ই পরিত্যাজ্য৷ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাদের সম্মানিত স্থাপনায় ফুল দিয়ে সম্মান জানায়৷ আমরা মুসলিম হয়েও তাদের ধর্মীয় উৎসবের ন্যায় যদি আমরাও কোনো স্থাপনায় ফুল দিয়ে সম্মান জানানোর সংস্কৃতি গ্রহণ করি, তাহলে সেটা অবশ্যই ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বনের নামান্তর, যা হাদীসে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে৷ হাদীসে এসেছে:

عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من تشبه بقوم فهو منهم.

"হযরত ইবনে উমার রাযি. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। " (সুনানে আবূ দাঊদঃ ৩৫১২)

কেউ আবার এটা বলতে যাবেন না, যে তারা তো শুধু সম্মান করে, আর কিছু তো করে না। একটু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, এই তো। আর কিছু তো না। এতে আর এতো ক্ষতি কী? আমরা বলব, এক্ষেত্রে একটি বিষয় কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার ক্ষেত্রে যারা ফুল দেয়, সম্মান করে তাদের বোধ, চেতনা, অনুভূতি, আদর্শ ও আকীদাই যে মূল বিষয়; এটা বাম ঘরানার তাদের অনেকের

লেখাতে স্পষ্টতই দেখা যায়। এটা এখন একটি জাজ্বল্যমান সত্য। **এটা আদর্শ ও আকীদার বিষয়। এটা আদর্শ ও আকীদার যুদ্ধ।** যেমন, তাদের একজন লিখেছেন, "শহীদ স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। লক্ষ ফুলের সমাবেশ ঘটেছে শহীদ মিনারে। কিন্তু যে বোধ চেতনার কারণে ঐ শ্রদ্ধা নিবেদন, তাই যদি লালন করা না হয়, তাহলে শহীদবেদিতে ফুল দিয়ে লাভ কি?"

আসলে এই হক বাতিলের লড়াইয়ে আমরা যতই ছাড় দেব বাতিল ততই আমাদেরকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে। কারণ এটা আকীদা ও আদর্শের লড়াই। এটা সত্য মিথ্যার যুদ্ধ। সুতরাং আমরা তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য যা-ই করি না কেন, তারা কখনোই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। যেমনটি আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনে বলে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ১২০ নং আয়াতে বলেন,

(وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) [البقرة: 120]

ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। [সূরা বাকারাহ্: 120]

তাদের আরো একজন লিখেছেন, - এতটুকু লেখা যার-ই হোক। ওদের মূল বক্তব্য কিন্তু এটাই। ওদের সবার আদর্শ কিন্তু এটাই। মিডিয়ায় তারা এই বিষয়গুলো জোর গলায় বুক ফুলিয়ে বলে থাকে। সুতরাং এই বক্তব্যগুলোকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু মুসলিমদের সচেতন হওয়া উচিত। কুরআনী নির্দেশনার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।
তিনি লিখেছেন, "মনে পড়ে একবার শহীদ মিনারে দেখলাম বেশ কিছু মাদরাসার ছাত্র। শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় স্লোগান দিচ্ছে 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার'। কেউ কিছু বলছে না। ভাবটা এই রকম যে এই স্লোগান দিয়ে তারা গর্ববোধ করছে। হঠাৎ ওই স্লোগান শহীদ মিনারে দেওয়া হচ্ছে কেন? এই স্লোগান তো ধর্মীয় স্লোগান। মসজিদে ওয়াজ মাহফিলে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, মুসলমানরা এই স্লোগান দিয়ে থাকে। পরক্ষণেই দেখলাম শহীদ মিনার ছেড়ে যেতে না যেতেই তাদের প্রতিরোধ করেছে, অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ ছাত্রসমাজ। মনে হলো ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করে তারা শহীদ মিনারকে বিতর্কিত করতে চায়। কিন্তু তা সফল হয়নি। ...... হৃদয় ওদের পাকিস্তান, বাইরে বাংলাদেশ। তাই জাতীয় সংগীত ও পতাকার মর্যাদা দিবে কীভাবে? বলতে ওরা তাই দ্বিধাবোধ করে না ধর্মভিত্তিতে জাতীয় সংগীত ও পতাকা পাল্টে দিতে। বেশ কয়েক বছর শারীরিক অসুস্থতার কারণে শহীদ মিনারে যেতে পারি না। বাসায় বসে যেসব কথা মনে জাগে তার কিছুটা এখানে প্রকাশ করলাম"

এখানে আমরা শুধু এতোটুকুই বলব, **হে মুসলিমগণ! আল্লাহর দিকে ফিরে আসো।**

হাদিস শরীফে এসেছে, আবু মালিক আশআ'রী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمْ الْأَرْضَ ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা রমনীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিবেন। আর তাদের কিছুকে বানর ও শূকর বানিয়ে দিবেন। (ইবন মাজাহ ৪০২০ সহীহ ইবনে হিব্বান ৬৭৫৮)

আমাদের জানা জরুরি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে কোন মুসলিম মৃত বরণ করলে (চাই স্বাভাবিক মৃত্যু হোক বা জিহাদের ময়দানে শাহাদত বরণ করুক অথবা অন্যায়ভাবে জুলুমের শিকার হয়ে মৃত্যু হোক) তার জন্য কী কী করণীয় তা নির্দিষ্ট করা আছে। যেমন: তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের পক্ষ থেকে গরিব-অসহায় মানুষকে দান-সদকা করা ও জনকল্যাণ মূলক কাজ করা, সদকায়ে জারিয়া মূলক কার্যক্রম করা, তাদের উদ্দেশ্যে হজ-উমরা আদায় করা ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে তারা কবরে উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ্। এটাই উপরোল্লেখিত শরীয়তসম্মত পন্থার ব্যাখ্যা।

পক্ষান্তরে তাদের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তথাকথিত স্মৃতিস্তম্ভ ও শহীদ মিনার নির্মাণ করা, তাতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা ও সেনাবাহিনী কর্তৃক স্যালুট জানানো, তাদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা, মোমবাতি জ্বালানো, মশাল জ্বালানো, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন প্রজ্বলন ইত্যাদি হল, অমুসলিমদের সংস্কৃতি। যা অমুসলিম সংস্কৃতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিমরা অবলীলাক্রমে তাদের অন্ধ অনুকরণবশত: পালন করে থাকে। ইসলামের সাথে এগুলোর দূরতম কোন সম্পর্ক নাই। অথচ ইসলামে অমুসলিমদের অনুসরণ-অনুকরণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ-চাই তা ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক অথবা আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি বা কৃষ্টি-কালচারের ক্ষেত্রে হোক। কেননা হাদিসে এসেছে:

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে।” [সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়: পোশাক-পরিচ্ছেদ হা/৪০৩১-হাসান সহিহ্] এছাড়াও হাদিসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের পূর্বে অনেক মুসলিম ইহুদি-খৃষ্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ করবে বলে ভবিষ্যতবাণী করেছেন-বর্তমানে যার বাস্তব প্রতিফলন আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

সাহাবী আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حذو القذة بالقذة حَتَّى لَوْ دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدخلتُمُوهُ قالوا: يَا رسول الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. قَالَ:» «فَمَنْ؟

“তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তী উম্মতদের অভ্যাস ও রীতি-নীতির ঠিক ঐ রকম অনুসরণ করবে, যেমন এক তীরের ফলা অন্য এক তীরের ফলার সমান হয়। অর্থাৎ তোমরা পদে পদে তাদের অনুসরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি ষণ্ডা (মরুভূমিতে বসবাসকারী গুই সাপের ন্যায় এক ধরণের জন্তু বিশেষ) এর গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে।”
সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী উম্মত দ্বারা আপনি কি ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বোঝাচ্ছেন?
তিনি বললেন: তবে আর কারা?
[বুখারি, অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: ”তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতির অনুসরণ করবে।” তবে বুখারির বর্ণনায় حذو القذة بالقذة – এই শব্দসমূহ নেই। তার স্থলে شبرا بشبر وذراعا بذراع শব্দগুলো রয়েছে। অর্থাৎ এক হাতের বিঘত যেমন অন্য হাতের বিঘতের সমান হয় এবং এক হাতের বাহু অন্য হাতের বাহুর সমান হয়।]

এমন কি সরাসরি মৃতদের কবরেও এসব কার্যক্রম করা দীনের মধ্যে চরম গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। আর শহিদ মিনার বা স্মৃতি সম্ভে ফুল দেয়া সরাসরি শিরক না হলেও তা শিরকের দিকে ধাবিত হওয়ার মাধ্যম। কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ তো বটেই। সব দিক থেকেই তা পালন করা হারাম। (আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন)

অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শবিনা খানি, কুলখানি, ইসালে সওয়াব, মিলাদ মাহফিল, মৃত্যু বার্ষিকী পালন, স্মরণ সভা, ওরশ মাহফিল ইত্যাদি হল দীনের মধ্যে নব সংযোজিত বিদআত। আর বিদআত হল, ভ্রষ্টতা এবং জাহান্নামের পথ। ইসলামের লেবাস পরা ‘দেখিত সুন্দর’ প্রতিটি বেদআতই হল, শয়তানের দেখানো সুসজ্জিত পথ।

কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের মধ্যে কোনও কমতি রেখে গেছেন তাহলে সে প্রকারান্তরে ইসলামকে অপূর্ণ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘রেসালাতের দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী’ হিসেবে অভিযুক্ত করল। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ ইসলাম পরিপূর্ণ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণাঙ্গভাবে তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং তাতে সামান্যতম সংযোজন ও বিয়োজনের কোনও সুযোগ নাই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই হওয়া সাল্লাম দ্বীনের ভিতর নতুন নতুন বিদআত তৈরি করার ব্যাপারে কঠিন ভাবে সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেন,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ

“দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্ট বিষয়াদি থেকে সাবধান! কারণ প্রতিটি নতুন আবিষ্কৃত বিষয়ই গোমরাহি। [মুসতাদরাক, কিতাবুল ইলম, আলবানী রা. হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলা সাহীহা (সহীহ হাদিস সিরিজ) হাদিস নং ২৭৩৫]

তিনি সা. বিভিন্ন সময় খুতবা দেয়ার শুরুতে বলতেন:

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“অতঃপর,সর্বোত্তম বাণী হল আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম নির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশনা। সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস হল দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়াদি। আর প্রতিটি নতুন বিষয়ই ভ্রষ্টতা। [সহীহ মুসলিম, অনুচ্ছেদ: নামায এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করা।]

সারকথা হলো, শহিদ মিনারে ফুল দেয়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন ও তাদের অন্ধ অনুকরণের কারণে হারাম। কোনও মুসলিমের জন্য কথিত শহিদদের বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কোনও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নাই। কেউ অজ্ঞতাবশত: এমনটি করে থাকলে তার উচিৎ, অনতিবিলম্বে আল্লাহর নিকট তওবা করা। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী।

পাঁচ.

পৃথিবীতে প্রথম শিরক এর ঘটনা :

দুনিয়াতে প্রথম শিরক সংঘটিত হয়েছিল নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর তা হয়েছিল সৎ ও বুযর্গ লোকদের মাধ্যমে। কুরআনে এসেছে, মুশরিকরা বলে, (খবরদার!) ‘তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের পূজিত উপাস্য ওয়াদ, সুওয়া‘, ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব, নাস্র-কে কখনোই পরিত্যাগ করবে না’। (এভাবে) ‘তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে এবং (তাদের ধনবল ও জনবল দিয়ে) নূহ-এর বিরুদ্ধে ভয়ানক সব চক্রান্ত শুরু করে’ (নূহ ৭১/২১-২৩) ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, এ আয়াতে যে ক’টি নাম এসেছে এগুলো নূহ (আঃ) এর কওমের বুযর্গ লোকদের নাম। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের প্ররোচিত করল, তারা যেন ঐসব বুযর্গগণ যেসব আসরে বসতেন সেখানে তাদের প্রতিমা বানিয়ে রাখে এবং তাদের নামে এগুলোর নামকরণ করে। তারা তাই করল। তবে এগুলোর উপাসনা হত না। এসব লোক মৃত্যুবরণ করার পর ক্রমান্বয়ে তাওহীদের জ্ঞান বিস্মৃত হল, তখন এগুলোর উপাসনা ও পূজা হতে লাগল (বুখারী, হা/৪৯২০)।

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস(রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, এই লোকগুলি হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের অনুসারীদের এই মর্মে ধোঁকা দিল যে, এঁদের বসার স্থানগুলিতে এক একটি মূর্তি বানাও ও তাদের নামে নামকরণ কর। লোকেরা তাই করল।

আদম (আঃ)-এর সময়ে ঈমানের সাথে শিরক ও কুফরের মুকাবিলা ছিল না। তখন সবাই তওহীদের অনুসারী একই উম্মতভুক্ত ছিল (বাক্বারাহ ২/২১৩) । তাঁর শরী'আতের অধিকাংশ বিধানই ছিল পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষের মধ্য শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে। নূহের কওম ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাস্র প্রমুখ মৃত নেককার লোকদের অসীলায় আখেরাতে মুক্তি পাবার আশায় তাদের পূজা শুরু করে। এই পূজা তাদের কবরেও হ'তে পারে, কিংবা তাদের মূর্তি বানিয়েও হ'তে পারে। মুহাম্মাদ ইবনু ক্বায়েস বলেন, আদমও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়কালের এই পাঁচজন ব্যক্তি নেককার ও সৎকর্মশীল বান্দা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্ত অনুসারীগণকে শয়তান এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, এইসব নেককার মানুষের মূর্তি সামনে থাকলে তাদের দেখে আল্লাহর প্রতি ইবাদতে অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ফলে তারা তাদের মূর্তি বানায়। অতঃপর উক্ত লোকদের মৃত্যুর পরে তাদের পরবর্তীগণ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ঐ মূর্তিগুলিকেই সরাসরি উপাস্য হিসাবে পূজা শুরু করে দেয়। তারা এইসব মূর্তির অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত'। আর এভাবেই পৃথিবীতে প্রথম মূর্তিপূজার শিরকের সূচনা হয়।

এই মূর্তিগুলি পরবর্তীকালে আরবদের মধ্যেও চালু ছিল। 'ওয়াদ' ছিল বনু কালবের জন্য দূমাতুল জান্দালে, সুওয়া' ছিল বনু হোযায়েলের জন্য, ইয়াগূছ ছিল বনু গুত্বায়েফ-এর জন্য জুরুফ নামক স্থানে, ইয়া'ঊক্ব ছিল বনু হামদানের জন্য এবং নাস্র ছিল হিমইয়ার গোত্রের বনু যি-কালা এর জন্য'।

আমরা হয়ত মনে করি এই যে শহিদ মিনার বা স্মৃতিসৌধ এগুলোকে তো আমরা পূজা করি না বা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ফুল দেই না, এগুলো শুধুমাত্র দেশের সংস্কৃতি। এগুলোর সাথে অহেতুক ধর্মকে সংযুক্ত করা ঠিক নয়। অহেতুক ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সময়ের সাথে এগুলোকে মেনে নিয়েই আমাদের চলতে হবে! যখন এগুলো সম্পর্কে ইসলামের বিধি নিষেধ মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয় অধিকাংশ শিক্ষিত শ্রেণী ঠিক এই প্রশ্নটিই করে থাকে যে, আমরা তো ইবাদতের জন্য এগুলো করি না, তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা আছে। শুনুন তাহলে।

শহিদ মিনার স্মৃতিসৌধ ইত্যাদির ইতিহাস শুরু হয়েছে সেই নুহ (আঃ) এর সময় থেকে! শুনে অবাক লাগছে? সেই মজার শিক্ষণীয় ইতিহাসের কিঞ্চিতাংশ গল্পাকারে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আশা করি এটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের জন্য আলোচ্য বিষয় বুঝতে সহায়ক হবে, ইনশা আল্লাহ। এবং খুব সহজেই ধারনা লাভ করতে পারবেন যে আলেম ওলামা মোল্লা মুন্সিরা কেন শহিদ মিনার, স্মৃতিসৌধ বা পাকা কবর মাজারের বিরুদ্ধে কথা বলেন।

আদম (আঃ) ও নুহ (আঃ) এর মধ্যে ব্যবধান ছিল ১০ করন বা যুগ। এখানে যুগ বলতে প্রজন্মকে বুঝানো হয়েছে। আমাদের মত ১২ বছরে ১ যুগ নয়। এই যুগের সকলেই ছিলেন ইসলামের অনুসারী। এই সৎকর্মশীলদের যুগের পর নুহ (আ. এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যার ফলে যুগের অধিবাসীরা ধীরে ধীরে শিরকে লিপ্ত হতে শুরু করে।

আমি পাঠকদের অনুরোধ করব, লেখাটি পড়ার সাথে সাথে বর্তমান অবস্থার সাথে লেখার ভাব মেলানোর চেষ্টা যেন অবশ্যই করেন। তাহলে লেখাটির শিক্ষণীয় দিকটি পেতে সুবিধা হবে।

নুহ আঃ এর সম্প্রদায়ের যুগের পূর্বযুগে কয়েকজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুছ ইত্যাদি। ইনারা ছিলেন সে যুগের পুণ্যবান ব্যক্তি। মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধা সম্মান ও মান্য করত। তখনও সেখানে ইসলাম বিদ্যমান ছিল। এ সকল ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু হলে তাদের অনুসারীদের কাছে মানুষের বেশে হাজির হয়ে শয়তান তাদেরকে পরামর্শ দেয় যে এসকল পুণ্যবান ব্যক্তিদের বসার জায়গায় তাদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ বা প্রতিকৃতি তৈরি করে রাখার জন্য। শয়তান তাদেরকে মন্ত্রণা দেয় যে এই স্মৃতিস্তম্ভ দেখলে তাদের সেই সকল পুণ্যবান ব্যক্তিদের কথা স্মরণ হবে, এতে তারা বেশি বেশি ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হবে।

এই প্রজন্মের লোকদের মৃত্যুর পর পরবর্তি প্রজন্মের লোকদের ইলম বা জ্ঞান লোপ পায়। শয়তান আবার তাদের কাছে এসে হাজির হয় এবং তাদের কাছে বলে যে তোমাদের পূর্ব প্রজন্মের লোকেরা ওই সকল পুণ্যবান ব্যক্তিকে অসিলা হিসেবে গ্রহণ করত। শয়তান একই সাথে তাদেরকে এই প্ররোচনা দেয় যে পুণ্যবানদের নামে স্তম্ভের নামকরণ করার। তার কিছু কাল পরে প্ররোচনা দেয় স্তম্ভের জায়গায় পূর্ববর্তূ নেককারদের মুর্তিস্থাপনে। এতে তাদের ওসিলা গ্রহণ সুবিধা হবে। লোকেরা শয়তানের প্ররোচনায় ওইসকল পুণ্যবানদের নামে মুর্তিস্থাপন করে। এবং সেই সকল মুর্তিকে প্রথমে ওসিলা বানানো শুরু করে এবং ধীরে ধীরে পূজা করা শুরু করে।

ইবনে জারীর (র) মুহাম্মদ ইবনে কায়স (র) এর বরাতে বলেন-
তারা ছিলেন আদম আঃ ও নুহ আঃ এর মধ্যবর্তি পুণ্যবান লোক। তাদের বেশ কিছু অনুসারী ছিল। তারপর যখন তাদের মৃত্যু হয়, তখন তাদের অনুসারীরা বলল, ”আমরা যদি এদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করে রাখি তাহলে তাদের কথা স্মরণ করে আমাদের ইবাদতের আগ্রহ বাড়বে।”
তখন তারা তাদের প্রতিকৃতি নির্মান করে রাখে। তারপর যখন তাদের মৃত্যু হয় এবং তাদের পরের প্রজন্ম আসে, তখন শয়তান তাদের এ বলে প্ররোচনা দেয় যে লোকজন তাদের উপাসনা করত এবং তাদের ওসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত। তখন তারা তাদের পূজা শুরু করে দেয়।

ইবনে আবু হাতিম উরওয়া ইবনে জুবায়র সুত্রে বর্ননা করে, ‘ওয়াদ’ ছিলেন এদের বয়সে সকলের চাইতে প্রবীণ এবং সর্বাধিক পুণ্যবান ব্যক্তি।
‘ওয়াদ’ এর মৃত্যুর পর তার কবরের চতুর্পার্শ্বে পাশে সমবেত হয়ে জনতা শোক প্রকাশ শুরু করে। ইবলিশ তা দেখে মানুষের রূপ ধারণ করে তাদের কাছে এসে বলে, এ ব্যক্তির জন্য তোমাদের হা-হুতাশ আমি লক্ষ করছি। আমি কি তোমাদের জন্য তাঁর অনুরূপ প্রতিকৃতি তৈরি করে দেবো? তা তোমাদের মজলিশে থাকবে আর তোমরা তাঁকে স্মরণ করবে। তারা বলল, হ্যাঁ, দিন। ইবলিশ তাদেরকে তার অনুরূপ প্রতিকৃতি তৈরি করে দিল। আর তারা তা তাদের মজলিশে স্থাপন করে তাকে স্মরণ করতে শুরু করে।

ইবলিশ তাদেরকে তাঁকে স্মরণ করতে দেখে এবার বলল, আমি তোমাদের প্রত্যেক ঘরে ঘরে এর একটি

মুর্তি স্থাপন করে দেই ? তাহলে নিজের ঘরে বসেই তোমরা তাঁকে স্মরণ করতে পারবে। তখন ইবলিশ প্রত্যেক গৃহবাসীর জন্য তাঁর একটি করে মুর্তি স্থাপন করে দেয় এবং তারা তাঁর স্মরণ করতে থাকে। এভাবে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাঁকে দেবতা সাব্যস্ত করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁকে পূজা করতে শুরু করে।
কালক্রমে সেই প্রতিকৃতিগুলোকে দেহবিশিষ্ট মুর্তিতে পরিণত করে এবং তারপর আল্লাহ্র পরিবর্তে ওইসকল মুর্তির পূজা শুরু করে।

হাবশায় অবস্থিত 'মারিয়া' নামক গির্জা ও তাতে স্থাপিত প্রতিকৃতি সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) বলেন, তাদের নিয়ম ছিল তাদের মধ্যে কোন সৎকর্ম পরায়ণ কেউ মারা গেলে তার কবরের উপর তারা একটি উপাসনালয় নির্মান করত। তারপর তার উপর তাঁর প্রতিকৃতি স্থাপন করে রাখত। আল্লাহ্র নিকট তারা সৃষ্টির সবচাইতে নিকৃষ্ট জাতি। – বুখারী ও মুসলিম।

এখন আমরা দেখব সেই যুগের সাথে বর্তমান যুগের মিল। এবং এর ক্ষতিকর দিক।
*১ শয়তান মন্ত্রণা দেয় পুণ্যবানদের প্রতিকৃতি স্থাপন করলে তাদের স্মরণে ইবাদতের আগ্রহ বাড়বে! হুবহু একই ধারনা থেকে আমরা সমাজের সম্মানিত মানুষদের বা নেতাদের বা উল্লেখযোগ্য মানুষদের প্রতিকৃতি নির্মান করেছি তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতে এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে ফুল দেয়া হয়। তার কবরে মাজার তৈরি হয়েছে। জিয়াউর রহমানের কবরে দলীয়ভাবে ফুল দেয়া হয়! কাজী নজরুল ইসলামের কবরেও একইভাবে ফুল দেয়া হয়।

*২ শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ নির্মান করা হয়েছে ভাষা শহীদ ও স্বাধীনতার শহীদদের স্মরণের জন্য ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য!
শয়তান মন্ত্রণা দিয়েছে যে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধার জন্য তোমরা কিছু স্তম্ভ বানাও এবং তাতে তাদের সম্মানে ফুল দাও! স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ, শিখা অনির্বান তৈরী কর, এতে ফুল দাও। হুবহু একই সুত্র ! আমরাও ঠিক সেই রূপ করছি যেরূপে নুহ (আঃ) এর সম্প্রদায় শিরকে পতিত হয়েছিল!

*৩ সমাজের একটা অংশ বিশেষ করে সংস্কৃতিকর্মিরা নিহতের বা মৃত ব্যক্তির স্মরণে এবং নেতাদের সমর্থক তাদের নেতাদের স্মরণে এই ধরনের প্রতিকৃতি নির্মান বা এসকল কাজে বেশি আগ্রহী থাকে। এই প্রজন্মের পরের প্রজন্ম তাদের আগ্রহের আর বিকৃত রূপ করে নিবে।

দেখেন বাংলাদেশের আদালত শহিদ মিনাদের পাদদেশকে পবিত্র বলে ঘোষণা দিয়েছে সেখানে জুতা পায়ে উঠা অবমাননা বা বেয়াদবি!
এখনো আশ্চর্য হোন নি?
জুতা পায়ে দিয়ে শহীদমিনারে ফুল দেওয়ায় পত্রিকায় রিপোর্ট করে তিরস্কার করা হচ্ছে!
কলাগাছ, ইট ইত্যাদি দিয়ে অস্থায়ী শহিদ মিনার বানিয়ে তাতে ফুল দেওয়া হচ্ছে!
সমাজের যেকোন উল্লেখযোগ্য কেউ মারা গেলে তার নামে স্তম্ভ বানানোর হিড়িক লেগে আছে!

পীর বুজুর্গের অনুসারীরা তাদের পীর বা বুজুর্গের কবরে মাজার তৈরি করা শুরু করেছে!

আজকাল ঠিক একইভাবে শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধে আমরা ঠিক একই কাজ করছি। আমরা মৃতদের স্মরণে খাম্বা বানিয়েছি প্রাচীর তুলেছি । তারপরেও কিছু লোক প্রশ্ন খুঁজে ফিরে কি করে এই শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ হারাম হতে পারে? বাংলাদেশের আদালত শহীদ মিনারকে উপাসনালয়ের মতই পবিত্র ঘোষণা করেছে । যার প্রেক্ষিতে মাঝেমধ্যেই সংবাদপত্রে লিখে থাকে- "পবিত্র বেদিতে জুতা নিয়ে চলাচল- দেখার কেউ নেই"; নাউজুবিল্লাহ। তারপরেও মানুষ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে এখানে শিরক হলো কোথায়? নুহ (আঃ) সম্প্রদায়ের মতই কিছুকাল পরে না জানি আরো কতকিছু ঘোষিত হয়।

খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সময় তাকে সংবাদ দেওয়া হল যে, কতিপয় মানুষ ঐ বৃক্ষের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে যে বৃক্ষের নিচে সাহাবীগণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে বায়াআত করেছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ বৃক্ষকে কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। [ফাতহুল বারী, ৭/৪৪৮]

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর কিতাব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত, খোলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও সকল আলেম একমত যে, মুশরিকদের বিরোধিতা করতে হবে এবং তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না। [মাজমুউল ফাতওয়া, ২৫/৩২৭]

বর্তমানে স্কুল, কলেজ, সরকারী মাদ্রাসা সহ প্রত্যেকটি সরকারী, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক । আমাদের যুগে ছবির ব্যাপক ব্যবহারের কারণে এসব বিষয় কারো চোখে পড়েনা। এই চোখে না পরাটাই শয়তানের ফিতনা। অমুসলিমদের দিকে দেখুন, তারা ঘরে -দোকানে-অফিসে মুর্তির পরিবর্তে তাদের দেবতাদের ছবিও টাঙিয়ে রাখে। যেকোন ছবিকে যদি পূজা, বশ্যতা কিংবা রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে রাখা হয় তবে তা নিশ্চয় মুর্তিপূজা। কয়দিন পর ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্য বানিয়ে ফুল দিবে।

একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের প্রায় নব্বই শতাংশ মুসলমান। কিন্তু এ দিবস উদযাপন উপলক্ষে যা করা হয় তা মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ, তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। শহীদ মিনারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের অনেক কিছুরই মিল আছে হিন্দুদের পূজা-পার্বণের সাথে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

১. হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমাকে যে উঁচু স্থানে স্থাপন করা হয় সে স্থানকে বলা হয় বেদী, শহীদ মিনারের পদমূলকেও বলা হয় বেদী। বেদী শব্দটির অর্থ 'হিন্দুদের যজ্ঞ বা পূজার জন্য প্রস্তুত উচ্চভূমি।' (সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী)

২. প্রতিমা বা মূর্তির বেদীমূলকে পবিত্র মনে করা হয়, তাই সেখানে যেতে হয় নগ্নপদে। শহীদ মিনারের মূলকেও পবিত্র মনে করার কারণেই সেখানে নগ্নপদে যেতে হয়।

৩. হিন্দু দেবদেবীর পূজার সময় কয়েকটি বিষয় অপরিহার্য। এগুলো হল : লগ্ন, অর্ঘ্য বা নৈবেদ্য, স্তব বা স্তুতি, পুরোহিত, দেবতা ও অর্চনা। এসবের সাথেও একুশে ফেব্রুয়ারির আচার-আচরণের সাদৃশ্য আছে। যেমন, অনুষ্ঠান জিরো আওয়ারে শুরু করা (লগ্ন), নির্দিষ্টভাবে আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো … ' গান গেয়ে কাজ করা (স্তব/স্তুতি), শহীদ মিনার (জড়পদার্থ)-কে নীরবে শ্রদ্ধা জানানো (অর্চনা)।

আবুল হাইয়াজ আল আসাদী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আলী বিন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু আমাকে বলেন যে, আমি কি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করব না, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? তা হলো যেখানেই প্রতিমা ও ভাস্কর্য দেখবে ভেঙ্গে ফেলবে এবং যেখানেই সুউচ্চ কবর দেখবে সমান করে দেবে'
অনুরূপ ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে চুনকাম করা ও সৌধ তৈরী করা থেকে নিষেধ করেছেন। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর বসা ও সৌধ তৈরী করা থেকে নিষেধ করেছেন। [মুসলিম]

ছয়.

কারো মৃত্যুতে নীরবতা পালন করা এটা অমুসলিমদের সংস্কৃতি।

অমুসলিমদের অনুকরণে মৃত ব্যক্তির কবরে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, মৃত ব্যক্তির কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা শরীয়তসম্মত নয়। এগুলো বিজাতীয় সংস্কৃতি। বিধর্মীদের আবিষ্কার। আর বিজাতিদের অনুসরণের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে-সে তাদের দলভুক্ত হবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪০৩১
সুতরাং মুসলমানদের কর্তব্য এসব অহেতুক মনগড়া কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা।

কারো মৃত্যুতে নীরবতা পালন করা,স্ত্রী ব্যাতিত অন্য কাহারো জন্য ৩ দিনের চেয়ে বেশি শোক পালন,শোক দিবস পালন,জাতীয় পতাকাকে স্যালুট দেয়া, শহীদ মিনারে ফুল দেয়া, ইসলাম কখনোই এগুলোর অনুমোদন দেয়না।

এক মিনিট নীরবতা পালনঃ এটা হারাম

কায়েস ইবনু আবী হাযেম বলেন, "আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) (হজের মওসুমে) যায়নাব নামক আহ্মাস গোত্রীয় এক মহিলার নিকট গেলেন। তিনি দেখলেন, সে কথা বলে না। তিনি বললেন, সে কথা

বলে না কেন? লোকেরা বলল- তার হজটি এমন যাতে সে নীরবতা পালন করছে। আবু বকর তাকে বললেন,তুমি কথা বল। তোমার এ নীরবতা পালন অবৈধ। এটি জাহেলিয়াতের (শিরক ও অজ্ঞতা) যুগের কাজ। অতঃপর সে মহিলাটি কথা বলল [বুখারী]

শোক দিবস বলতে ইসলামে কিছুই নেই

ইসলামে যদি শোকদিবস বলতে কিছু থাকতো, তাহলে রাসূল সা. এর ইন্তিকালের দিনটি হত সবচেয়ে শোকের দিন। কারণ তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ব-চরাচরের যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়ে গিয়েছিলো তা ছিলো অপূরণীয়। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যুগে তার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রাসূল সা. এর জীবদ্দশায় তার সন্তান ও মা ইন্তিকাল করেছেন, তিনি তাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিবসে কোনো কিছুর ইন্তিজাম করেননি ।এছাড়া মৃত ব্যক্তির জন্য 'নিয়াহা' বা শোক অনুষ্ঠান পালনের ব্যাপারে সরাসরি রাসূল সা. থেকে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তিনি বলেন,

" المَيِّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بِما نِيحَ عليه.

শোক অনুষ্ঠান করার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়"(বুখারী)।

শোক অনুষ্ঠান রাসূল সা. এর যুগেও ছিলো। তবে এটি কোনো ইসলামী রীতি তো ছিলোই না। বরং ছিল মুশরেকদের মধ্যে প্রচলিত জাহেলি যুগের একটি রীতি। রাসূল সা. একে কুফরি বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

اثنتانِ في الناسِ هما بهم كفرٌ : الطعنُ فيالأنسابِ ، و النِّياحةُ على الميِّتِ.

মানুষের মধ্যে এমন দুইটি বিষয় রয়েছে যা কুফরি। এক: বংশ নিয়ে অপবাদ দেয়া। দুই: নিয়াহা বা শোক অনুষ্ঠান পালন করা। (সহীহ মুসলিম)

স্বামী ছাড়া অন্য কারো মৃত্যুতে নারীদের জন্য তিনদিন শোক পালন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০ দিন অথবা গর্ভবতী হলে প্রসব পর্যন্ত শোকপালন করা ওয়াজিব। এসময় তারা রঙিন পোশাক, অলংকার, মেহেদী, সুরমা ইত্যাদি ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। এবং স্বামীর বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পারবে না। তবে পুরুষের জন্য এধরনের কোনো বিধানও নেই। অর্থাৎ পুরুষরা নির্দিষ্ট কোনো আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে শোক পালন করতে পারবে না।

রাসূল সা. বলেন,

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য তার স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি সময় হিদাদ (শোক করা ও সাজসজ্জা থেকে বিরত থাকা) বৈধ নয়। আর স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০ দিন হিদাদ পালন করবে। (সহীহ্ বুখারী ১২৮০)

সাত.

নিজের মা-বাবা হোক কিংবা অন্যের মা-বাবা। যে কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য কিছু করতে চাইলে তা যদি আমরা ইসলামি নিয়ম মেনে করি তাহলে আমাদের উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে। টাকাগুলোও নষ্ট হবে না। মৃত ব্যক্তির জন্য আমরা কি করতে পারি চলুন তা দেখে নেই।

১- কোনো দিন বা সময় নির্দিষ্ট না করে দুয়া করা।

.
আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

আর যারা পরবর্তীতে আসবে, তারা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, এবং আমাদের সেসকল ঈমানদার ভাইদের ক্ষমা করুন যারা আমাদের পূর্বে গত হয়েছে। {সূরা হাশর-১০}

২. সদকায়ে জারিয়া বা এমন সাদকা যা থেকে মানুষ মৃত্যুর পরও উপকৃত হতে থাকে। যতদিন মানুষ উপকৃত হবে ততদিন সাওয়াব পৌঁছাতে থাকবে

৩- এমন জ্ঞান-যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। সেই জ্ঞান একজন থেকে আরেকজন যতদিন পৌঁছাতে থাকবে ততদিন সাওয়াব জারী থাকবে।

৪. এমন নেক সন্তান- যে তার জন্য দু‘আ করে।

২,৩, ও ৪ এর দলীল...

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩ টি আমল বন্ধ হয় না-১. সদকায়ে জারিয়া ২. এমন জ্ঞান-যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ৩. এমন নেক সন্তান- যে তার জন্য দু‘আ করে। (সহিহ্ মুসলিম)

৫. সাধারণ সাদাকা।

দলীল...- أَنَّ رجُلًا قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:إنَّ أُمِّي افتُلِتَتْ نفْسُها (أي: ماتت فجأةً)، وأظُنُّها لو تكَلَّمَتْ تصَدَّقَتْ، أفأتَصدَّقُ عنها؟ قال: نعَمْ، تصَدَّقْ عنها. وفي روايةٍ: فهلْ لهاأجْرٌ إنْ تصَدَّقْتُ عنها

"এক ব্যক্তি রাসূল সা. কে বলল, আমার মা হঠাৎ করে মারা গেছে। আমার ধারণা সে কথা বলার সুযোগ পেলে দান করতে বলত। আমি কি তার পক্ষ থেকে দান করতে পারবো? তিনি বললেন হ্যাঁ। তার পক্ষ থেকে সাদাকা করো। (তাখরীজুল মুসনাদ, হাদীসের মান: সহীহ)

৬. সিয়াম পালন করা। নফল সিয়ামের দলীল না থাকলেও ওয়াজিব সিয়ামের ব্যাপারে অনুমোদন রয়েছে।

দলীল... مَن مَاتَ وعليه صِيَامٌ صَامَ عنْه ولِيُّهُ. ‘আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সওমের কাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে সওম আদায় করবে। (সহীহ্ বুখারী)

৭. মাদ্রাসায় কুরআন শরীফ বা দ্বীনী কিতাবাদী কিনে দেয়া।

৮. মসজিদ নির্মাণ করা

৯. মুসাফিরখানা বা পান্থশালা নির্মাণ করা

১০. খাল-বিল, নালা, ইত্যাদিতে পানি প্রবহিত করার ব্যবস্থা করা

১১. কূপ খনন করা। (অথবা টিউবওয়েল, মোটর ইত্যাদি বসিয়ে দেয়া)

৭,৮,৯,১০ ও ১১ এর দলীল...

أنَّ أمَّهُ ماتتْ فقال لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم إنَّ أُمي ماتت أفأَتصدَّقُ عنها ؟ قال : نعمْ . قال : فأيُّ الصدقةِ أفضلُ ؟ قال : سقيُ الماءِ

" এক ব্যক্তি রাসূল সা.কে বলেন, আমার মা ইন্তিকাল করেছেন আমি কি তার জন্য সাদাকা করতে পারবো? রাসূল সা. বললেন হ্যাঁ। সে বলল, উত্তম সাদাকা কী? মৃত ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম সাদাকা হলো পানি পান করানো।" (আস সুনান ওয়াল আহকাম)

أنه صلى الله عليه وسلم قال:" إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علماً علمه ونشره، أو ولداً صالحاً تركه أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً بناه لابن السبيل أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه من

" بعد موته

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুমিন ব্যক্তির আমলনামায় তার মৃত্যুর পর যেসব আমল যুক্ত হয় তা হচ্ছে এমন ইলম যা সে প্রচার-প্রসার করেছে, এমন সৎ সন্তান যে তার মৃত্যুর পর বিদ্যমান রয়েছে, কোরআন মাজীদ যা সে দান করেছে, মসজিদ ও পান্থশালা যা সে নির্মাণ করেছে, এমন সাদাকা যা সে সুস্থাবস্থায় বা জীবদ্দশায় করে গেছে।

১২. হজ্ব পালন করা। যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে। দলীল...

أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال ." : "حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء

"জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আগমণ করে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা হজ্ব করার মান্নত করেছিলেন কিন্তু তিনি হজ্ব সম্পাদন না করেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ কর। তোমার মার উপর ঋণ থাকতো তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না ? সুতরাং আল্লাহর জন্য তা আদায় কর। কেননা আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করার অধিক উপযোগী" (সহীহ বুখারী)

১৩. কবর যিয়ারত করা।

زوروا موتاكم وسلِّموا عليهم فإنَّ لكم فيهم عِبرة

রাসূল সা. বলেন, মৃতদের কবর যিয়রাত করো এবং তাদেরকে সালাম করো কেননা তার মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। (তাখরীজুল ইহয়া, মুরসাল ও হাসান)

১৪. মৃত ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা

১৫. মৃত ব্যক্তির বন্ধু বান্ধবদের সাথে সদাচার করা।

১৬. মৃত ব্যক্তির রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।
১৩,১৪ ১৫ ও ১৬ এর দলীল...

بينما أنا جالسٌ عند رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ إذ جاءه رجُلٌ مِن الأنصارِ، فقال: يا رسولَ اللهِ، هل بَقِيَ علَيَّ مِن بِرِّ أبوَيَّ شيءٌ بعد موتِهما أبَرُّهما به؟ قال: نَعمْ، خِصالٌ أربعةٌ: الصلاةُ عليهما، والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدِهما، وإكرامُ صديقِهما، وصلةُ الرَّحِمِ التي لا رَحِمَ لك إلا مِن قِبَلِهما؛ فهو الذي بَقِيَعليك مِن بِرِّهما بعد موتِهما.

হজরত আবুল আসাদ আস সায়িদি মালিক বিন রবীয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আসলেন। তিনি বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতার ইন্তেকালের পরও তাদের জন্য কিছু করার আছে কি? তিনি বললেন হ্যাঁ, তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার, তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ, তাদের বন্ধুবান্ধবদের সাথে সদাচার এবং তাদের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। (আবু দাঊদ)

আট.

শরীয়তের বিধান হলো হারাম কাজকে হালাল মনে করা শিরক ও কুফরী। যদি কেউ মনে করে তাহলে তার ঈমান চলে যাবে। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

اِتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللهِ-

‘আল্লাহর পরিবর্তে তারা তাদের আলেম ও সাধু-দরবেশদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে’ (তওবা ৩১)।

আদী বিন হাতেম (রাঃ) আল্লাহর নবীকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনে বলেছিলেন,

‘ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ

ওরা তো তাদের ইবাদত করে না’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন,

وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

‘তা বটে। কিন্তু আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা ওদেরকে তা হালাল করে দিলে ওরা তা হালালই মনে করে। একইভাবে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা ওদেরকে তা হারাম করে দিলে ওরা তা হারামই মনে করে। এটাই তাদের ইবাদত করা’।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ-

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তারা তাকে হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীনকে তাদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না’ (তওবা ২৯)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ اللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ

‘আপনি বলুন, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে যে রূযী দান করেছেন, তন্মধ্যে তোমরা যে সেগুলির কতক হারাম ও কতক হালাল করে নিয়েছ, তা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? আপনি বলুন, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এতদ্বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর নামে মনগড়া কথা বলছ’ (ইউনুস ৫৯)।

হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করার অর্থ হল,কোনো কিছুকে হালাল এবং হারাম ঘোষণা প্রদানের একচ্ছত্র অধীকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে হালাল এবং হারামকারী মনে করা শিরক ও কুফরী। যদি কেউ মনে করে তাহলে তার ঈমান চলে যাবে।

শহীদ মিনার কি?

উইকিপিডিয়াতে আছে; শহীদ মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভ বলতে এমন এক ধরনের কাঠামোকে বুঝানো হয়ে থাকে, যা শৈল্পিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক কারনে আত্নউৎসর্গকৃত ব্যক্তিদের স্মরনে নির্মাণ করা হয়েছে। তবে উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে শহীদ মিনার বলতে যারা বাংলা ভাষা আন্দোলনে শহীদ (আত্নত্যাগ) হয়েছেন, তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে যা নির্মাণ করা হয়েছে সেই স্থাপনাগুলোকে বুঝায়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কি?

উইকিপিডিয়াতে আছে; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলাদেশের জনগণের ভাষা আন্দোলন এবং ভাষাশহীদদের স্মরণে পালিত দিবস। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিতে ঢাকায় কয়েকজন ছাত্র-জনতা পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। তাঁদের স্মরণে ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে সারা বিশ্বে এ দিবস পালন শুরু হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবি জানিয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, যেহেতু ইউনেস্কোর উদ্দেশ্যসমূহের মূলে রয়েছে বিশ্বের ভাষাসমূহের পারস্পরিক সহঅবস্থান এবং যেহেতু বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মূর্ত ও বিমূর্ত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম, সেহেতু এ দিবসের স্বীকৃতি শুধু ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বহুভাষিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, বরং বিশ্বে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের পূর্ণ সচেতনতার জাগরণও ঘটাবে এবং সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও

মতামতের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংহতিকে উদ্বুদ্ধ করবে।

প্যারিস অধিবেশন অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, মাতৃভাষাসমূহের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কার্যকর পন্থাসমূহের অন্যতম হলো বিশ্বব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠা করা এবং এ দিনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন ও ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে ভাষাবিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন করা। এ উপলক্ষে প্যারিস সম্মেলন ২১ ফেব্রুয়ারিকে উপযুক্ত দিন হিসেবে নির্ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল মাতৃভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নজিরবিহীন আত্মত্যাগের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি। ১৯৫২ সাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কতটা ভাবগম্ভীর পরিবেশে অদ্যাবধি দিবসটি পালন করছে তাও এ সম্মেলনে যথার্থ গুরুত্বের সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়। সমাপ্ত।

আমরা এবার একটু দেখি, একুশে ফেব্রুয়ারিতে সারাদেশে ও শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে কি কি হয়?

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সারাদেশে ও শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে, সঠিক রং ও মাপে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলো যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হয়। রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ ও কোরআনখানির আয়োজনসহ দেশের সকল উপাসনালয়ে ভাষা শহীদদের রুহের মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক স্থানগুলোতে বাংলাসহ অন্যান্য ভাষার বর্ণমালা সম্বলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করা হয়। একুশের বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং ভাষা শহিদদের সঠিক নাম উচ্চারণ, শহিদ দিবসের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শহিদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, ইত্যাদি জনসচেতনতামূলক বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমসমূহ প্রয়োজনীয় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এবং সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসংলগ্ন এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করা হয়।

শহীদ মিনারে জরুরি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিকিৎসাক্যাম্প স্থাপন ও পর্যাপ্ত সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় সকল ধরনের সরঞ্জামাদিসহ ফায়ার সার্ভিস টিম প্রস্তুত রাখা হয়।

রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানসহ সবাই পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে যেন শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ মিশনগুলো শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ, বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা সভা, পুস্তক ও চিত্র প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে; যেখানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং বাঙালি অভিবাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীতে ট্রাকের মাধ্যমে রাজপথে ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠান এবং নৌযানের সাহায্যে ঢাকা শহর সংলগ্ন নৌপথে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজনসহ জেলা-উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর তিন ধরনের পোস্টার মুদ্রণ করে যার মধ্যে প্রথমটি হয় সর্বজনীন, দ্বিতীয়টি স্কুল-কলেজের শিশু-কিশোরদের জন্য এবং তৃতীয়টি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ ও বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক দূতাবাসগুলোতে প্রচারের জন্য।

বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গ্রন্থমেলা, আলোচনাসভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, সুন্দর হাতের লেখা ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও অধীনস্থ শাখা জাদুঘরগুলো এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সব প্রত্নস্থল ও জাদুঘরগুলোতে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (অটিস্টিক) শিশুদের বিনা টিকেটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

সাথে সাথে পত্রপত্রিকা ও নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে আমরা আরো কিছু তথ্য পেয়ে থাকি। এদিনে সারাদেশের বিভিন্ন শহর উপশহরে বসে মদের আড্ডা। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়

মাদকের সিরিঞ্জ ও ফেনসিডিলের বোতল। কেউ কেউ শহীদদের স্মরণার্থে সেদিন স্পেশাল ড্রিঙ্কস্ এরও ব্যবস্থা করে।

কখনো কখনো বেদির পূজায় অগ্রগামীতার তকমা অর্জনের জন্য লড়াইও করতে হয়। প্রয়োজনে খুন ঝরাতেও প্রস্তুত থাকতে হয়। এই নিকৃষ্টরা আমাদেরকে এসব নোংরামিই শেখাতে চায়।

শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া নিয়ে মহসিন কলেজ ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ।
https://bangla.bdnews24.com/ctg/article2018546.bdnews

শহীদ মিনারে ফুল দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপি-ছাত্রলীগ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, আহত ৬
https://bangla.thedailystar.net/news...cs/news-453201

শহীদ মিনারে ফুল দেয়া নিয়ে শ্রমিক লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৬
https://samakal.com/whole-country/ar...6%A4-%E0%A7%AC

যশোরে শহীদ মিনারে বোমাবাজি, পুলিশের গুলি
https://bangla.bdnews24.com/samagrab...1108175.bdnews

এসব দিবসে কেউ কেউ মেতে উঠে নোংরা ডিজে পার্টিতে। রাতের নিস্তব্দতাকে মাতিয়ে রাখে গগনবিদারী উল্লাসে। বাংলাদেশে রাতের পার্টি মাতানো ডিজে দুনিয়া আসলে কেমন?
https://www.bbc.com/bengali/news-40427007

অনেক সুশীলকে এসময় এই জাতীয় উৎসব ও ডিজেদের রাতের নিরাপত্তাহীনতা নিয়েও শঙ্কিত থাকতে দেখা যায়। তারা নারী অধিকার নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন। নিজেদেরকে নারী অধিকারকর্মী হিসেবে পরিচয় দিতেই তাদের তৃপ্তি বেশি।
https://www.bbc.com/bengali/news-50960170

কি হয় ডিজে পার্টিতে? ফ্রি স্টাইলে চলছে উদ্দাম নৃত্য ও গান। এসব পর্টিতে উড়ানো হয় লাখ লাখ টাকা। চলে নামি-দামি ব্রান্ডের বিদেশী মদ-বিয়ার বিক্রি। পেগ ও বোতল ধরে বিক্রি করা হয় ব্রান্ডের মদ।
https://old.bhorerkagoj.com/2021/11/...6%AA%E0%A6%BE/

পত্রিকায় আসে শুধু অনুমোদনহীন পার্টিগুলোর কথাই। অনুমোদিত যেটা সেটা তো এই ধর্মে বৈধই।

সেদিন মূর্তির সম্মানে যা যা করা হয়ঃ শহীদ মিনারকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ: যেগুলো ইসলামে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ

শহীদদের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তথাকথিত স্মৃতি স্তম্ভ ও শহীদ মিনার নির্মাণ করা ও মেরামত করা হয়। তাতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা ও সেনাবাহিনী কর্তৃক স্যালুট জানানো হয়।

শহীদ মিনারে ফুল দেয়া হয়। শহীদ মিনারের বেদিতে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক ও পেশাজীবী সংগঠনসহ বহু মানুষ। এই বেদিতে উৎসর্গকৃত ফুলগুলো হয় অনেক পবিত্র। এমনকি অনুষ্ঠান শেষে এসব পঁচা ফুলের সাথে করা অসম্মানী নিয়ে প্রশ্নও উঠে। জবাব চাওয়া হয়, শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার ফুলে 'অশ্রদ্ধার পদদলন' কেন। সুধীজনেরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে থাকেন, 'শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেওয়া ফুলগুলোর প্রতি এমন অবহেলা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে সবারই সতর্ক থাকা উচিত।' চিন্তা করুন প্রিয় পাঠক! কেমন পবিত্র সেই চেতনা আর কেমন দামী সেই ফুল?

শহীদ মিনারের মূল বেদিতে জুতা পায়ে উঠা নিষিদ্ধ। খালি পায়ে আসতে হয়। এরূপ আকীদা রাখা হারাম।

অনৈক্য কুফরের নিদর্শন জাতীয় পতাকাকে স্যালুট দেয়া হয়। শিরকী জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে দিন শুরু করতে হয়। এটি হারাম।

শহীদদের উদ্দেশ্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা, মোমবাতি জ্বালানো, মশাল জ্বালানো, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন প্রজ্বলন করা হয়। এটিও একটি হারাম।

তারা খাম্বা আর প্রাচীর তুলে দিয়ে সেখানে উৎসব করে চলেছে প্রতি বছর প্রতি বিশেষ দিবসে। এটিও একটি হারাম।

শহীদ মিনারে গিয়ে নারীপুরুষ ধাক্কাধাক্কি করা হয় । এটিও আরেকটি হারাম।

ইসলামের ফরয বিধান পর্দার কঠিন অবমাননা করা হয়। পর্দাহীনতাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এটিও আরেকটি হারাম।

সরকারি চাকুরেদের ক্ষেত্রে শহীদমিনার, কোনো ব্যক্তির ভাস্কর্য ইত্যাদিতে ফুল দিতে হয়, এগুলোর

সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এসব থেকে বিরত থাকলে অনেকসময় চাকুরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটিও আরেকটি হারাম।

ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে হাতে ফুল, কালো পোশাক, ব্যাজ ধারণ করে ধীর ধীর পায়ে শ্রদ্ধা জানাতে আসতে হয়। খালি পায়ে একে একে শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। এটিও আরেকটি হারাম।

এসময় অনেককে ভাষা শহীদদের স্মরণে জাহেলী গান, কুফরি জাতীয়তাবাদের দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। এটিও আরেকটি নিকৃষ্ট হারাম।

চেহারায় পতাকার তিলক আঁকতে হয়। জাতীয়তাবাদকে মনে প্রাণে ও বুকে ধারণ করতে হয়। এটিও আরেকটি হারাম।

হে বিবেকবান মুসলিম! বলো, এতোসব হারাম সম্বলিত একটি দিবস পালন কিভাবে অবৈধ-হারাম ও নিষিদ্ধ না হয়ে থাকতে পারে?

একজন লিখেছেন, নানা ধর্মের মতো বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ ধর্মে নানা প্রথাগত আচরণও আছে -বিমূর্ত মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পুষ্প অর্ঘ্য দেয়া, চেহারায় পতাকার তিলক আঁকা, মোমবাতি জ্বেলে শোক জানানো, মৃতদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখা কিংবা আকাশে ফানুশ ওড়ানো। এ ধর্মে আছে উৎসব-শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস কিংবা বিজয় দিবস। আছে তীর্থস্থান -শিখা অনির্বাণ, শহীদ মিনার আর স্মৃতিসৌধ। আছে উৎসর্গ -বিরুদ্ধবাদীদের জীবন, সাধারণ মানুষের জীবন। এ ধর্মে দীক্ষিতরা ছওয়াব কামানো চকচকে চোখে স্লোগান দিয়ে রাজপথ কাঁপায়:- 'ধরে ধরে জবাই করো'; পিছনে থাকে রাষ্ট্রের রক্ষীবাহিনী। বাঙ্গালি ধর্মের জন্য আলাদা উপাসনালয় প্রয়োজন পড়ে না, জাফর ইকবালরাই আচ্ছাহ্। শিশুরা জাতীয় পতাকাকে সালাম করে, জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে দিন শুরু করে। 'চেতনা'ধারীরা নবী সেজে ধর্মগ্রন্থ লেখেন-শিশুরা তা পড়ে পাঠ্যবইয়ে, আর বুড়োরা সংবাদপত্রে।

চলুন, আরো কিছু দেখি।

শিশুদেরকেও এসব শিরকি মতবাদে অভ্যস্ত করানোর পায়তারা চলছে।
https://www.dainikbangla.com.bd/wholebd/13723

নিন্দাবাদ করে পত্রিকায় নিউজ হয়, মাদ্রাসাগুলোতে নেই কোনো শহিদ মিনার! ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শহিদ মিনারে ফুল দেওয়ার কোনো নিয়ম নেই। সে জন্য ভাষা শহিদদের স্মরণে মাদ্রাসাগুলোতে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয় না। এই সত্য কথাটা বলতে গিয়ে অনেককে জীবনশঙ্কায়ও ভুগতে হয়।
https://www.khaborerkagoj.com/history-tradition/802350

এদিন চেতনাবিলাস করা হয়; একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। বিপরীতে বাঙালি ধর্মমতে যারা শহীদ; সেই শহীদদের বর্তমান আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গের প্রতি এই ধর্মানুসারীদের প্রতিক্রিয়া কী দেখুন। সংবিধানমতে শহীদদের সম্মান করা কর্তব্য হলে, তাদের পরিবারকে অবহেলা করা হবে কেন? আসলে এখানে শহীদদেরকে সম্মান করা উদ্দেশ্য, নাকি অন্যগুলোর মতো এটাও আড়ালে ঢেকে রাখা হিন্দুত্ববাদীদের সিক্রেট প্রজেক্ট?

প্রধানমন্ত্রী ডেকে খোঁজখবর নিতে পারেন, ভাষাশহীদ সন্তানের আকুতি।
https://www.ajkerpatrika.com/259753/...A6%B7%E0%A6%BE

একজন স্কুলশিক্ষককে স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়। বিশেষ করে পিটিতে শিক্ষার্থীদেরকে দাড় করিয়ে জাতীয় পতাকার প্রতি সেলুট করানো হয়। আবার শহীদ দিবসে, শহীদ মিনারে ফুল দিতে হয়। অন্যথায় চাকুরি যায়।

উপরের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কুফল ও অবক্ষয়গুলো দেখেই পাঠকবর্গ বুঝে ফেলেছেন, যে এমন একটা অনৈতিক অনৈসলামিক দিবস যা শত শত অনৈতিকতার জন্ম দেয়, এমন দিবস কোনো ভাবেই পালিত হতে পারে না। অন্তত বিবেকবান মুসলিম সমাজে না। আর আমাদের মাঝে ধর্মীয় এবং সামাজিক বলতে যে দুটি ধারায় আমরা বিভক্ত হয়ে গেছি, ইসলাম মনে করে তা ঠিক না। ইসলামের সবগুলো বিধানই সামাজিক। অসামাজিক কোনো কালচার মুসলিম সমাজে থাকতে পারে না। অর্থাৎ ধর্ম সমাজ থেকে আলাদা না এবং সমাজও ধর্ম থেকে কোনোভাবেই স্বাধীন না। একারণে আমি "ধর্মীয় এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ" এটাইপের শব্দ ব্যবহার করতে পছন্দ করি না। তবে স্থানভেদে বিশেষ প্রয়োজনে পাঠকের সুবিধার্থে কখনে কখনো ব্যবহার করতে হয়।

এবিষয়ে শরীয়াহর অবস্থান নিয়ে সংশয়বাদীদের অলীক সংশয়সমূহ ও সেগুলোর জবাব

সংশয় ০১ঃ- আমাদের শহীদ মিনারে ফুল দেয়ার বিষয়টি। এর কারণ শুধুই ভাষা শহীদদের স্মরণ ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এই সম্মান প্রদর্শন কখনোই চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া না যে তাদের পূজা করা বা তাদের ইবাদত করা কিংবা তাদের সৃষ্টিকর্তার আসনে বসানো (নাউজুবিল্লাহ)। তাহলে আমরা যদি তাদের কেবলই সম্মান প্রদর্শনের জন্য শহীদ মিনারে ফুল দেই, তাহলে তো সেটা শিরক হবে না। যদি ভাষা শহীদদের ইবাদত করতাম বা এই কাজের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করতে চাইতাম, সেটা শিরক হত। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে তারা মৃত, তাদের সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে শুধু তাদের সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারটি কোনভাবেই শিরক হতে পারে না। আমরা শুধু যুদ্ধে নিহতদের শ্রদ্ধা জানাই।

সংশয় ০২ঃ- সনাতন ধর্মালম্বীরা মনে করেন যে তারা যে মূর্তি গড়েন, সেই মূর্তির মধ্যেই তাদের দেবতার বাস। কিন্তু যারা শহীদ মিনারে ফুল দিচ্ছে, তারা কি এটা ভাবে যে শহীদ মিনারের ঐ স্তম্ভগুলোর মধ্যেই

ভাষা শহীদেরা বা তাদের আত্মার বাস? না, তারা মনে করে না। সুতরাং, কারো যদি শহীদ মিনারে ফুল দেয়া কেবলই ভাষা শহীদদের সম্মান প্রদর্শনের একটা স্মারক হয়ে থাকে, তবে তা কোনমতেই শিরক হবে না।

সংশয় ০১ ও ০২ এর জবাবঃ- শ্রদ্ধা জিনিসটা শুধু মন থেকে আসে, হিন্দুদের মতো গান বাজনা, ঢাক ঢোল পিটিয়ে, মাযারে, মূর্তির সামনে ফুল দিয়ে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমির মতো করে জয়োতসব করে কোটি কোটি টাকা খরচ করে, মানুষের সময় ও শক্তি নষ্ট করে শ্রদ্ধা জানানোর দরকার নেই, ইসলাম এই সমস্ত বিজাতীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণ হারাম করেছে৷ কত মানুষ না খেয়ে আছে,শীতের রাতে কষ্ট করে আর গণতন্ত্রবাদী বিভ্রান্ত লোকেরা কোটি কোটি টাকার ফুল কিনে দেশের সম্পদ ও টাকা নষ্ট করছে।

এটা কোনোভাবেই বলা যাবে না, যে তারা তো শুধু সম্মান করে, আর কিছু তো করে না। একটু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, এই তো। আর কিছু তো না। এতে আর এতো ক্ষতি কী? আমি বলব, এক্ষেত্রে একটি বিষয় কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার ক্ষেত্রে যারা ফুল দেয়, সম্মান করে তাদের বোধ, চেতনা, অনুভূতি, আদর্শ ও আকীদাই যে মূল বিষয়; এটা বাম ঘরানার তাদের অনেকের লেখাতে স্পষ্টতই দেখা যায়। এটা এখন একটি জাজ্বল্যমান সত্য। এটা আদর্শ ও আকীদার যুদ্ধ। যেমন, তাদের একজন লিখেছেন, "শহীদ স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। লক্ষ ফুলের সমাবেশ ঘটেছে শহীদ মিনারে। কিন্তু যে বোধ চেতনার কারণে ঐ শ্রদ্ধা নিবেদন, তাই যদি লালন করা না হয়, তাহলে শহীদবেদিতে ফুল দিয়ে লাভ কি?"

আসলে এই হক বাতিলের লড়াইয়ে আমরা যতই ছাড় দেব তারা ততই আমাদেরকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে। কারণ এটা আকীদা ও আদর্শের লড়াই। এটা সত্য মিথ্যার যুদ্ধ। সুতরাং আমরা তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য যা-ই করি না কেন, তারা কখনোই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। যেমনটি আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনে বলে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ১২০ নং আয়াতে বলেন,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ)
مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) [البقرة: 120]

ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। [সূরা বাকারাহ্: 120]

ওরা ইবাদতের উদ্দেশ্যে করে না অথচ ইবাদতের বিষয়গুলো এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে।
যেমনঃ খালি পায়ে যাওয়া, বিনম্র হওয়া, মাথা ঝুকে ফুল দেওয়া, সম্মান দেখানো, বেদিকে পবিত্র বলা ইত্যাদি !!!
জুতা নিয়ে উঠলে বেদির অসম্মান হয় কেন যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে না হয়? খাম্বাগুলোকে সম্মান না দিলে দোষ হয় কেন যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে না হয়? বিনম্র না হলে অন্যায় হয় কেন যদি ইবাদতের

উদ্দেশ্যে না হয়? তারপরেও একই কথা" আমরা তো ইবাদতের জন্য করি না"! অথচ তারা খাম্বা আর প্রাচীর তুলে দিয়ে সেখানে উৎসব করে চলেছে প্রতি বছর প্রতি বিশেষ দিবসে।

কোনো মূর্তির পায়ে ইবাদতের উদ্দেশ্যে হোক আর এমনি এমনি হোক ফুল দেয়া যদি ভয়াবহ বড় শিরক হয়ে তবে একটি খাড়া খাম্বা আর মূর্তির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? একজায়গায় মানুষের আকৃতি দেয়া হয়েছে আরেক জায়গায় মানুষের আকৃতি ব্যতীত ভিন্ন আকৃতি দান করা হয়েছে! দুটিই জড় বস্তু! দুটোই পূজনীয়।

বিজয় র্যালি, বিজয় মিছিল, বিজয় অনুষ্ঠান তো এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই। এই উৎসবেরই অংশ এগুলো। কেউ খাম্বাপূজা পর্যন্ত যাচ্ছে আবার কেউ ইসলামের লেবাস লাগিয়ে আনন্দমিছিল পর্যন্ত থেমে থাকছে ভোটের জন্য। যারা বিজয় মিছিল করছে তাদের কাছে আহবান রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) বহু যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, বিজয়ী হয়েছেন, মক্কা জয় করেছেন। খিলাফতকালে বহু দেশ জয় করেছেন তাদের কয়জন কবে কোনদিন কয়বার ”বিজয়” মিছিল করেছেন? বিজয় মিছিল হারাম এর দলিল খুঁজে পান না ”হালালের” দলিল কি আমাদের দেখাতে পারবেন? এগুলো সব বিজাতীয়দের উৎসব।

@ ফুল দিলেই ইবাদত হয় না পূজা হয় নাঃ বর্তমান শিক্ষিত প্রজন্ম দাবী করছে ফুল দিলেই তা সরাসরি পূজা হয়না কেননা এখানে নিয়ত পূজার জন্য নয় শুধু শ্রদ্ধার জন্য।

আমরা বলি, আপনি পূজার নিয়ত না করার কারণেই তো শুধু তা পূজার সাদৃশ্য হচ্ছে, যারা পূজার নিয়ত করেই ফুল দেয় তাদের মত। যদি আপনি পূজার নিয়ত করেই ফুল দিতেন; তাহলে তো সাথে সাথে আপনি মুশরিক হয়ে যেতেন। তখন আর আপনি মুসলমান থাকতেন না। যেমন হিন্দু বৌদ্ধ অগ্নি, সুর্য পূজকদের বহু শাখা প্রশাখায় এভাবে ফুল ফল বা খাদ্য দিয়ে পূজা অর্চনা করে যাচ্ছে!
আপনি হয়ত ইবাদতের নিয়ত না করে ফুল দিচ্ছেন কিন্তু আপনি তো পরবর্তি প্রজন্মের সামনে শিরকের দ্বার খুলে দিয়ে যাচ্ছেন!

একসময় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ছিলনা। তাতে কেউ ফুলও দেয় নাই। এখন তার অনুসারীরা তাঁর প্রতিকৃতি নির্মান করেছে তার বাসার সামনে। এবং সেখানে বিনম্রচিত্তে মস্তক ঝুঁকিয়ে সম্মানের সাথে সেই প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়া হয়, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা হয়!

নিয়তের দোহাই দিয়ে বলছেন আপনি পূজা করছেন না কিন্তু এ যে হুবহু পূজার অনুরূপ কর্ম করছেন! আপনি ঘুরিয়ে শিরক করছেন এবং আপনার পরের প্রজন্মের জন্য সরাসরি শিরকের ব্যবস্থা ও পথ করে দিচ্ছেন! আপনি হয়ত পূজার নিয়ত করছেন না কিন্তু পরের প্রজন্ম যদি নিয়ত করেই করে? এই পথের প্রদর্শক যে আপনি?
যদি আমরা বিষয়গুলো উপলব্ধি করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তবে তা মুসলিম হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

কাদের থেকে শিখেছি এই পুস্পস্তবক অর্পণ? মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনীত ধর্মে পুস্পস্তবক অর্পণের কোন বিধান নেই। মৃতদের জন্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ খ্রিস্টান জাতির সংস্কৃতি। হিন্দু ধর্মেও মূর্তিকে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। শুধু পুস্পস্তবক অর্পণ নয় মিষ্টি, সন্দেশ, দুধ কলার স্তবকও অর্পণ করা হয় দেবভোগ হিসেবে। আল কুর'আনে ইবরাহীম (আলাইহি সালাম) এর ঘটনা বর্ণণা প্রসংগে বলা হয়েছে- “অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে, গিয়ে ঢুকল এবং বললঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না?” [সূরা সাফফাত ৯১-৯২]
মূলত পুস্পস্তবক অর্পণ মূর্তিপূজার অংশ, এটি একটি ইবাদত যা মূর্তিকে দেয়া হয়। কাজেই মুসলিমদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহনের কোন সুযোগ নেই। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “কোন ব্যক্তি সংস্কৃতিতে যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়” [আবু দাউস, সনদ উত্তম]

সংশয় ০৩ঃ- দেশকে ভালোবাসা খারাপ কিছুনা। "দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ"।

জবাব ০৩ঃ- "দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ" - এটা একটা জাল হাদীস, যা নাইন-টেনের বোর্ডের বইয়ে অর্ধ-শিক্ষিত হুজুরেরা লিখে রেখেছে। সবাই নিজের দেশকে ভালোবাসে, এটা খারাপ কিছুনা। তবে এটা নিয়ে জাতীয়াবাদী চিন্তাভাবনা, আমরা শ্রেষ্ঠ, আমরা আলাদা জাতি - এই ধরণের উগ্রপন্থী চিন্তাভাবনা ইসলামের শিক্ষাবিরোধী। দেশকে ভালোবাসা জায়েজ, কিন্তু দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে হিন্দুয়ানি কৃষ্টি-কালচার বা অনৈসলামিক সভ্যতা চালানোর অপচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। [“দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ”- এই কথাটিকে ইমাম ইবন জাওযি রহঃ, ইমাম আস-সাগানি রহঃ, ইমাম নাসির উদ্দিন আলবানি রহঃ জাল হাদিস বলে প্রমাণ করেছেন।]

এই জাল হাদিসটি মুসলমানদের মিথ্যা আশা দেয় যে তারা দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করেও দেশ প্রেমের জন্য জান্নাতে যেতে পারবে। যেই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং যেই দেশের সরকার ইসলামের নিয়ম অনুসারে দেশ পরিচালনা করে না, সেই দেশের জন্য প্রেম ঈমানের অঙ্গ হতে পারে না। ঈমানের একটি অত্যাবশ্যকীয় দাবি হচ্ছে আল্লাহ যেটা আমাদের জন্য ভালো বলেছেন সেটাকে মনে প্রাণে ভালো মানা এবং আল্লাহ আমাদের জন্য যেটাকে খারাপ বলেছেন, সেটাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করা।

এই ধরণের জাল হাদিস ব্যবহার করা হয় ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশের মুসলমানদের মধ্যে দেশের প্রতি অন্ধ ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য। কাফির সরকার দ্বারা পরিচালিত কাফির শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত একটি দেশের প্রতি প্রেম আর যাই হোক, অন্তত আল্লাহর প্রতি ঈমানের অঙ্গ নয়। তবে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে দেশের সাধারণ আইন মেনে চলা এবং দেশের উপকার করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, যতক্ষণ না সেটা ধর্মের বিরুদ্ধে না যাচ্ছে।

দেশপ্রেম নিয়ে কিছু কথা।

রব্বুল 'আলামীন' নামটা সূরা ফাতি'হাতে তালা মেরে আটকে রেখে দিতে হবে, বাস্তব জীবনে গাইতে হবে মাতার জয়গান।। আসলে কী রাষ্ট্র আর মা এক? মা কি বদলানো যায়? আমার দাদার 'মা" ভারতকে ভেঙ্গে নতুন 'মা' বানানো হয়েছিল পাকিস্তান। আমার বাবারা নতুন 'মা'কে আবার ভাঙলেন, এলো বাংলাদেশ। আমার বাবারা ভারত মাকে ঘৃণা করা শিখলেন, আর আমাদের ঘৃণা করতে শেখানো হল পাকিস্তানকে। নতুন মাকে ভালোবাসার শর্ত এটাই-আগের মাকে ঘৃণা করতে হবে। যে মা, মাটিকে রক্ষা করার জন্য প্রাণত্যাগের সংকল্প করা সেই মায়ের উপরেই হামলে পড়তে হবে ক'দিন পরে। যে মাকে মানুষ কাটে, মানুষ জোড়া লাগায় তাকে 'ইলাহ্*' হিসেবে মেনে নিতে হবে বাঙ্গালি হতে হলে।

ধর্ম হিসেবে দেশপ্রেম বড্ড একচোখা। রবীন্দ্রনাথের উপাধি 'বিশ্বকবি' আমরা জানি। উদ্দেশ্য- বাংলা পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া। তিনি যে সীমান্তের বেড়াজাল কাটিয়ে বিশ্বমানবতার মধ্যে ঐক্যের সূত্র বাঁধতে চেয়েছিলেন সে উপলব্ধিটা আমাদের কখনোই শেখানো হলো না। দেশ বলতে যদি রাষ্ট্র ধরা হয় তবে তার উপকরণ দুটি- মাটি ও মানুষ। মাটি মানে প্রকৃতি-অবোধ নদী, মূক পাহাড়, শ্যামল সবুজ, সজীব সব না-মানুষ। এদের সবার জীবন আছে, ভাষা আছে-যদিও তা আমাদের বোধের বাইরে। দেশপ্রেম বলতে যদি আমরা বুঝি রাষ্ট্রের সীমানাকে ঘিরে ভালোবাসা তাহলে পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের বাইরের প্রকৃতিকে কি ভালোবাসতে নেই? সবই তো একই স্রষ্টার সৃষ্টি। আর যদি দেশপ্রেম বলতে আমরা বুঝি দেশের মানুষকে ভালোবাসা তাহলে প্রশ্ন আসে কেন শুধু দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে, কেন গোটা দুনিয়ার মানুষকে নয়? মানবিকতাকে কাঁটাতারে আবদ্ধ করার যুক্তি কী?

১৯৪৭ সালের ৮ই জুলাই জীবনে প্রথমবারের মতো ভারতে আসার পর সাইরিল রেডক্লিফকে দায়িত্ব দেয়া হল ভারত ভাগ করে দাও। তিনি টেবিলে বসে কলম চালালেন, সীমান্ত তৈরী হলো। আমার দাদাকে বলা হলো পশ্চিম দিনাজপুরে যে গ্রামটিতে তুমি বড় হয়েছ সেটা এখন ভারত। তুমি পাকিস্তানী। তল্পি-তল্পা গোটাও। এক অপরিচিত জায়গায় বসিয়ে তাকে জানানো হল এটা তোমার দেশ-একেই তোমার ভালবাসা দিতে হবে। শৈশবের গ্রাম, গ্রামের মানুষগুলো আর তোমার আপন কেউ না। তোমাকে এখন প্রেম করতে হবে এমন মানুষের সাথে যাদের একটা কথাও তুমি বোঝ না। রাষ্ট্রীয় আদেশে প্রেম। ধর্ম হিসেবে বাঙ্গালি দেশপ্রেম যে আসলে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রভুদের সংজ্ঞার উপরে টিকে আছে এই তথ্যটুকুই ধর্মটা মিথ্যা হবার জন্য যথেষ্ট।

আমরা বিশ্বাস করি এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একজনই এবং এই পৃথিবীর মালিক তিনিই। আমাদের আগে বহু মানুষ এসেছিল যারা 'দেশ আমার, মাটি আমার' বলে মিথ্যা গর্ব করেছিল। এই দেশ, মাটি একই আছে কিন্তু সেই মানুষগুলো মাটির তলায় চলে গেছে। যখন আমরা এই পৃথিবীতে আসিনি তখন আমাদের দেশ কী ছিল? আমরা যখন মরে যাবো তখন আমাদের দেশ হবে কোনটা? মাটির তলায় কোন রাজত্ব চলে? কোন পুলিশ ডাণ্ডা মারে? কোন আদালত বিচার করে? যিনি বলছেন তিনি আগে বাঙ্গালি পরে মুসলিম তিনি কি দেশের নেতাদের আল্লাহর উপরে স্থান দিচ্ছেন না? এই লোকদের চরিত্র কী আমরা ভালো করে জানি না? এরা যে আমাদের আখিরাতে কেন দুনিয়াতেই জাহান্নাম দেখানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে সেটা কি আমরা বুঝি না? এদের আমরা আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসে ফেলছি না তো?

এদের ক্ষমতা দখলের লোভে আমরা আমাদের জীবন বিকিয়ে দিচ্ছি না তো? আমরা এত জেনে-বুঝেও এদের হাতের পুতুল হচ্ছি না তো?

আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি এই বাংলাদেশ না, পৃথিবীটাও না-আমাদের সত্যিকারের দেশ জান্নাত। আমরা সেই জান্নাতের জন্য কাজ করি যেখানে আমরা একদিন ছিলাম, যেখানে আমরা একদিন যেতে চাই। তাই আমরা প্রকৃতির বিপরীতে প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহকে একমাত্র 'ইলাহ্' হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমরা এই পৃথিবীর ভণ্ডদের না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছি। দুটোই আমাদের সচেতন প্রয়াস। আমরা জানি কেন এই বেছে নেয়া। যদি এই অবস্থানকে অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে পৃথিবী থেকে চলে যেতেও হয় আমরা রাজি। পৃথিবী কখনই আমাদের ছিলো না, সেটাকে ঘিরে স্বপ্নও তাই আমরা সাজাই না। আমরা সাধারণ মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সাধ্যে যা কুলায় করতে চাই। এই মঙ্গল কামনাটাও সীমানা দিয়ে আবদ্ধ নয়। আমরা এই দেশের মানুষের জন্য যা চাই-সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যেও তাই চাই। আমাদের কাছে এটাই দেশপ্রেম। আর এই দেশপ্রেমের উদ্দেশ্য মানুষের মনোতুষ্টি নয়, একুশে পদক পাওয়া নয়- আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আল্লাহ্ যেন আমাদের আবেগটাকে সৎ কাজে ব্যবহার করার তাওফিক্ব দান করেন, মন্দ মানুষদের চক্রান্ত বোঝার তাওফীক্ব দান করেন, ইসলাম বুঝে জীবনটাকে অর্থবহ করার তাওফীক্ব দান করেন। আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

সংশয় ০৪ঃ- অনেক জ্ঞান-মিসকীন অজ্ঞতাবশত অথবা গোঁড়ামিবশত এমন কিছু যুক্তি দিয়ে থাকে; যা সাধারণত কোনো সুস্থ ও বুদ্ধিমান মানুষ করতে পারে না। দেখুন, তারা কেমন প্রশ্নের অবতারণা করছে।
(১) আমরা কী একুশে ফেব্রুয়ারি, ছাব্বিশে মার্চ, ষোলোই ডিসেম্বর উদযাপন করার সময় আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করি? জবাব : না ! প্রশ্নই ওঠেনা।
(২) আমরা কি দিনগুলোকে ইবাদত করি? জবাব: না, অবশ্যই করিনা।
(৩) আমরা কি দিনগুলোর কাছে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করি? জবাব: না, নিশ্চয়ই করিনা।
(৪) আমরা কি দিনগুলোর কাছে বেহেস্ত প্রার্থনা করি? জবাব:- না, প্রশ্নই ওঠেনা।
(৫) আমরা কি দিনগুলোর কাছে দোজখ থেকে নাজাত প্রার্থনা করি? জবাব: না, অবশ্যই করিনা।
(৬) আমরা কি দিনগুলোর কাছে রোগশোক, বালামুসিবত থেকে রেহাই প্রার্থনা করি? জবাব: না, করিনা।
(৭) আমরা নি:সন্তান হলে দিনগুলোর কাছে কি সন্তান প্রার্থনা করি? জবাব: না, কখনোই করিনা।
(৮) আমরা কি দিনগুলোর কাছে পরীক্ষায় ভালো ফল, বিয়ে বা ব্যবসায়ে সাফল্য প্রার্থনা করি? জবাব: না, প্রশ্নই ওঠেনা।
(৯) আমরা কি শহীদ মিনারে, বিজয় স্তম্ভে বা স্মৃতিসৌধে রুকু সেজদা করি? জবাব: না, করিনা।
তাহলে?

জবাবঃ- এর উত্তরে আমরা নতুন কিছু বলব না। সংশয় ০১ ও ০২ এর জবাব থেকেই এদের এই সংশয়ের জবাব হয়ে যায়।

সংশয় ০৫ঃ- নবিজি করেন নাই, তাই আমরা করব না- এইটাই তো দাঁড়াইল? বাট এইটা ধর্মবিরোধী ক্যাম্নে হয়? নবিজির আরব জাতির সংস্কৃতি আর আমাদের সংস্কৃতি তো এক না। নবিজি পান্তাভাত, ইলিশ খান নাই, আমরা খাই, তিনি গরুর গাড়ি চড়েন নাই, আমরা চড়ছি- এইরকম মোটামুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে। এক জাতির সাথে আরেক জাতির কিছু পার্থক্য থাকে না? এইটাও তেমন। তিনি দোয়া করতেন, আমরাও দোয়া করি, সেইসাথে ফুল দেই।

জবাব ০৫ঃ- দিবস পালনের বিষয়টি শুধু সংস্কৃতির সাথে না, বরং এটা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দিবস পালনের বিষয়টিও ইসলামের নির্দেশনার বাহিরে থাকতে পারবে না। লোক-সংস্কৃতি বা আঞ্চলিক সংস্কৃতি ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ না তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। যদি কোথাও সংস্কৃতি এবং ইসলাম সাংঘর্ষিক হয়; তাহলে ইসলামই গালেব। ইসলামই গ্রহণযোগ্য। সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে ইসলামত্যাগ করা কোনোভাবেই জায়েজ নেই। এটি সর্বস্বীকৃত হারাম এবং অবৈধ। তাম্মাত।

أن العرف ما يعرف بين الناس أي: يعلم، ومثله العادة، وما اقتضاه العرف والعادة فإنه يعمل به إلا أن يكون مخالفا للشرع

প্রাসঙ্গিক মাসআলা-মাসায়েলঃ

০১. প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন খেলাধুলা আয়োজন করা হলে তাতে অংশ নেওয়া জায়েজ হবে কিনা। উত্তরঃ খেলাধুলা যদি শরীয়তসম্মত হয়, তাহলে এমন খেলাধুলায় অংশ গ্রহন করা জায়েজ আছে। আর যদি শরীয়তসম্মত পদ্ধতি না হয়,তাহলে সেখানে অংশগ্রহণ জায়েজ নেই। আরো জানুনঃ https://ifatwa.info/6265
অনেক সময় এসব খেলাধুলায় গান বাজনা হয়, নারী পুরুষ এক সাথে থাকে। ইসলামে গান বাজনা, বেপর্দা নারী পুরুষ একসাথে প্যান্ডেলে বসে থাকা নাজায়েজ। বাজি লটারি ও জুয়াভিত্তিক সকল খেলা না-জায়েজ। সুতরাং এহেন খেলাধুলায় অংশগ্রহন করা যাবে না।

০২. কবরে বাতি জ্বালানো একটি হারাম কাজ। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লানত করেছেন কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদের উপর এবং ঐ সকল লোকদের উপর যারা কবরের উপর মসজিদ বানায় এবং বাতি জ্বালায়। [আবু দাউদঃ সুনানু আবী দাউদ, সঃ ৩২৩৬; তিরমিযী, জামে’, সঃ ৩২০]

০৩. মৃত ব্যক্তি বা কবরবাসীর নিকট দোয়া করা বড় শিরক। যার কাছে দোয়া করা হবে, সে যদি জীবিত হয়ে থাকে এবং প্রার্থিত বস্তু প্রদান করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে শিরক হবে না। যেমন আপনি

কাউকে বললেন, আমাকে পানি পান করান, আমাকে দশটি টাকা দিন ইত্যাদি। এ ধরনের কথা শিরক নয়। সুতরাং ফকির যদি হাত বাড়ায় এবং বলে আমাকে কিছু দান করুন, তাহলে তা জায়েজ হবে। যেহেতু আল্লাহ্ বলেছেনঃ তোমরা তাদেরকে রিযিক হিসেবে কিছু দাও।

দ্বিতীয়ত, যার কাছে দোয়া করা হলো সে যদি মৃত হয়, তাহলে শিরক হবে এবং এতে লিপ্ত ব্যক্তি মুশরিকে পরিণত হবে। বড়ই আফসোসের বিষয় যে, কিছু কিছু মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এমন অনেক মুসলিম রয়েছে যারা বিশ্বাস করে যে, কবরে দাফনকৃত মাটির সাথে মিশে যাওয়া মৃত লোকটি উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখে অথবা সন্তানহীনকে সন্তান দিতে সক্ষম। এটি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ ধরনের শিরককে সমর্থন করা মদ্যপান, ব্যভিচার এবং অন্যান্য পাপ কাজ সমর্থন করার চেয়েও জঘন্য। আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন মুসলিমদের অবস্থা সংশোধন করে দেন।

০৪. শরীয়তের বিধান হলো, যদি অমুসলিমদের মেলায় এমন বস্তু ক্রয় বিক্রয় করা হয়, যা মূলত হালাল, যেমন বাচ্চাদের ছবিহীন খেলনা, হালাল খাবার ইত্যাদি, তাহলে উক্ত লেনদেন ও ক্রয়বিক্রয়কে হারাম ও নাজায়েজ বলার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু যেহেতু এভাবে দোকান দেয়ার মাধ্যমে অমুসলিমদের শান ও শওকত বৃদ্ধি হয়, তাই এসব স্থানে ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে এই বিক্রিত পণ্যের অর্থ হালাল হবে। [কিতাবুন নাওয়াজেল-১৬/৩৫১]

০৫. ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহীদমিনারে ফুল দেওয়ার জন্য কলেজের স্টুডেন্টদের থেকে যে টাকা বা চাঁদা তোলা হয়; তাতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নেই, হারাম। শরীয়তের বিধান মতে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া যেহেতু নাজায়েজ, তাই সেই নাজায়েজ কাজে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করাও নাজায়েজ। গুনাহের কাজ যেমন নিজে করা জায়েজ নেই,কাউকে গুনাহের কাজে সহযোগিতা করাও জায়েজ নেই। তবে এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভাবে যদি টাকা দিতেই হয়, এবং এটা ছাড়া যদি কোনো উপায় না থাকে, সেক্ষেত্রে টাকা দিলে ইস্তেগফার পাঠ করবেন। আল্লাহর কাছে তওবা করবেন। মহান আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٥:٢]

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা। {সূরা মায়িদা-২}

০৬. শোক দিবস বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে জাতীয় নেতার প্রতিকৃতি, মূর্তি বা ছবির সামনে ফুল দেওয়ার কোনো নজির ইসলামে নাই। এটি হারাম।
তাছাড়া ছবি ভিডিও শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।হযরত ইবনে আব্বাস রাযি থেকে বর্ণিত,

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صَوَّر صورة في الدنيا كُلِّف أن يَنْفُخ فيها الرُّوح يوم القيامة وليس بنافخ)

তরজমাঃ- ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, আমি নবী কারীম সাঃ কে বলতে শুনেছি, যে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন (জানোয়ারের) ছবি আকবে,কিয়ামতের দিন তাকে দায়িত্ব দেয়া হবে, সে যেন উক্ত ছবির ভিতরে রূহ প্রদান করে, অথচ রূহ প্রদান করা তার জন্য কস্মিনকালে ও সম্ভব হবে না (অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে আযাব প্রদান করা হবে) (সহীহ বুখারী -৫৬১৮)

একটি ফাতওয়া

সম্মানিত মুফতি সাহেব! আমার জানার বিষয় হলো, রাষ্ট্রীয়ভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি ও স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস সহ অন্যান্য দিবসগুলো পালন করার হুকুম কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উল্লেখ্য, আমরা জানি বর্তমানে দিবসগুলোতে প্রচুর পরিমাণে হারাম কাজ হয়। যেমন, ইট পাথর দিয়ে বানানো শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, মূর্তি, ভাস্কর্যে ফুল-চন্দন, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হয়, যা একটি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি। বিভিন্ন মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়, সেগুলোতে ফুল অর্পন করা হয়। শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। সেনাবাহিনী কর্তৃক স্যালুট জানানো হয়, মোমবাতি জ্বালানো, মশাল জ্বালানো, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন প্রজ্বলন ইত্যাদি হয়, যা আমরা জানি অমুসলিমদের সংস্কৃতি। শহীদ মিনারের মূল'কে পবিত্র মনে করার কারণে সেখানে নগ্নপদে যেতে হয়। গান গাওয়া হয়। জাতীয় পতাকাকে স্যালুট দেয়া হয়। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা করা হয়। শহীদ মিনারের মূল বেদিতে জুতা পায়ে উঠা নিষিদ্ধ। খালি পায়ে আসতে হয়। জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে দিন শুরু করতে হয়। শহীদ মিনারে গিয়ে নারীপুরুষ ধাক্কাধাক্কি করা হয় । ইসলামের ফরয বিধান পর্দার কঠিন অবমাননা করা হয়। পর্দাহীনতাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ধীর ধীর পায়ে শ্রদ্ধা জানাতে আসতে হয়। খালি পায়ে একে একে শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। কুফরি জাতীয়তাবাদের দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। চেহারায় পতাকার তিলক আঁকতে হয়। জাতীয়তাবাদকে মনে প্রাণে ও বুকে ধারণ করতে হয়। শিশুদেরকেও এসব শিরকি মতবাদে অভ্যস্ত করানোর পায়তারা করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকলে নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়।

উত্তরঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد

প্রশ্নে উল্লেখিত প্রতিটি কাজই স্বতন্ত্রভাবে হারাম। আর যে কাজ এতগুলো হারামকে সমন্বয় করে; তা হারাম, নাজায়েজ ও নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং সকল মুসলিমের উচিত এজাতীয় দিবস পালন থেকে বিরত থাকা এবং এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা।

মুফতি আবু মুহাম্মাদ হাফি.

فقط، والله تعالى أعلم بالصواب

আরো দেখুন। একটি ইসলাম বিরোধী বক্তব্যঃ ধর্ম যার যার উৎসব সবার।
https://umarbinkhattab.medium.com/%E...0-729766eb89e4

ইসলামে পহেলা বৈশাখ পালনের বিধান
https://umarbinkhattab.medium.com/%E...8-4038547bd9d8

মুসলিমদের মাঝে পৌত্তলিক রীতিনীতির অনুপ্রবেশ! সতর্কতা জরুরী!
https://ahlehaqmedia.com/7070/

কবরে ফুল দেওয়াঃ মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী রাহ.
https://www.alkawsar.com/bn/article/1647/

তাফসীরে কুরতুবী

فقال الملك : ابنوا عليهم بنيانا ; فقال الذين هم على دين الفتية : اتخذوا عليهم مسجدا . وروي أن طائفة كافرة قالت : نبني بيعة أو مضيفا ، فمانعهم المسلمون وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا . وروي أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم وتركهم فيه مغيبين . وروي عن عبد الله بن عمر أن الله - تعالى - أعمى على الناس حينئذ أثرهم وحجبهم عنهم ، فذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون معلما لهم . وقيل : إن الملك أراد أن يدفنهم في صندوق من ذهب فأتاه آت منهم في المنام فقال : أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب فلا تفعل ; فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود ، فدعنا .

وتنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة ; فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها ، إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز ; لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن . وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله - تعالى - يوم القيامة . لفظ مسلم . قال علماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد . وروى الأئمة عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها لفظ مسلم . أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى ، فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام . فحذر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مثل ذلك ، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال : اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : لما نزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا . وروى مسلم عن جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه . وخرجه أبو داود والترمذي أيضا عن جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وروى الصحيح عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته - في رواية - ولا صورة إلا طمستها . وأخرجه أبو داود والترمذي

আল ওয়াসীত লিত-তানতাবী

.ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بقوله: قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً

أى: أن الذين أعثرهم الله على أصحاب الكهف قال بعضهم: ابنوا على هؤلاء الفتية بنيانا يسترهم.. وقال الذين غلبوا على أمرهم، وهم أصحاب الكلمة النافذة، والرأى المطاع، لنتخذن على هؤلاء الفتية مسجدا، أى: معبدا تبركا بهم.

قال الآلوسى: واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء، واتخاذ مسجد عليها، وجواز الصلاة في ذلك وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي. وهو قول باطل عاطل، فاسد كاسد. فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» .

وزاد مسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك» .

وروى الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد..» .

Tags: ফিতনা, শহীদ মিনার ও দিবস পালন, সরকারী পাঠ্যবই ও ইসলাম

তাম্মাত।

সুবাহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আস্তাগফিরুকা ওয়া'তুবু ইলাইকা।